২০০৩

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ❑ ১৪ ও ১৫তম সংখ্যা

৩১ জানুয়ারী, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেবের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও আব্দুল বারী তালুকদার সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

তারুয়া জামাতের জলসা-গাহে জুমুআর খুতবা শ্রবণরত মুসল্লীদের মাঝে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার ৬০তম সালানা জলসার শ্রোতৃমন্ডলীর একাংশ।

## ইসলামে পরমত সহিষ্ণুতা

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ধারণা যে, এ ধর্মে পরমতসহিষ্ণুতা নেই; এমন কি তারা মনে করে যে, এ ধর্ম সন্ত্রাসকেও উৎসাহ দেয়। শুধু অন্য ধর্মাবলম্বী কেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের মাঝে মতপার্থক্যের কারণে যে সংঘাত চলছে তা দেখে বিশ্ববাসী মনে করছে যে, নিজেদের মধ্যে মত-পার্থক্য সহ্য করতেও এরা নারাজ এবং এজন্য বল প্রয়োগ এবং রক্তপাত করতেও প্রস্তুত।

শান্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইসলামের সাথে উপরে বর্ণিত ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নেই। এর অর্থ এই, কেউ যদি ইসলাম ধর্মকে মেনে না নেয় তাহলেও তার উপর কোন বল প্রয়োগ চলবে না। ইসলাম যুক্তির ধর্ম। কুরআন ঘোষণা করেছে যে দলিল দ্বারা পরাভূত সে-ই সত্যিকারে পরাজিত। বল প্রয়োগের কথা এখানে নেই। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সময় তাঁর কাছে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী একটি দল আসে এবং তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রার্থনা করতে চাইলে তিনি (সঃ) তাদেরকে মদীনার মসজিদের ভিতরেই প্রার্থনা করার অনুমতি দেন।

যারা ধর্মের নামে হিংসা-হানাহানির শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন তাদের প্রকৃত দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের একদিকে খোদা-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, অপর দিকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবতার প্রতি ভালবাসায় আপ্লুত করা। ইসলাম একদিকে যেমন ইবাদত-বন্দেগী শিখায় ঠিক তেমনি শেখায় মানব-সেবা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্‌তাআলা একটি সুন্দর মুসলিম সমাজ গঠনের পন্থা বর্ণনা করেছেন ঃ যেমন ♦মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই ♦তারা পরস্পরের মাঝে সংশোধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে ♦কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না ♦কোন জাতি বা গোষ্ঠীকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে না ♦একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ্‌তাআলা মুসলিম উম্মাকে হিংসা-বিদ্বেষের পথ পরিহার করে আল্লাহ্‌ ও রসূলের পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষানুযায়ী সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনের তৌফীক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

# পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১৩ ও ১৪তম সংখ্যা

১৮ মাঘ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ২৭ যিলকদ ১৪২৩ হিঃ কাঃ

৩১ সুলাহ ১৩৮২ হিঃ শাঃ ৩১ জানুয়ারী ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100



**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

**নির্বাহী সম্পাদক**
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

**বার্তা সম্পাদক**
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

**প্রচার সম্পাদক**
মাহবুবুর রহমান

**শিল্প নির্দেশক**
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

**সহকারী শিল্প নির্দেশক**
সালাহউদ্দীন আহমদ

**বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি**
আব্দুল আউয়াল ইমরান

**হিসাব ব্যবস্থাপক**
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

**বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা**
এ. কে. রেজাউল করীম

**বিদেশ প্রতিনিধি**

| | | |
|---|---|---|
| মোহাম্মদ আব্দুল হাদী | - | লন্ডন, ইউ কে |
| ইসমত পাশা | - | কানাডা |
| মোহাম্মদ খলিলুর রহমান | - | নিউ ইয়র্ক |
| মইন উদ্দীন সিরাজী | - | ক্যালিফর্নিয়া |
| আজিজ আহমদ চৌধুরী | - | জার্মানী |
| কাউসার আহমদ | - | হল্যান্ড |
| এন, এ, শামীম আহমদ | - | বেলজিয়াম |
| ইসমত উল্লাহ্ | - | জাপান |
| ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ | - | নিউজিল্যান্ড |
| ফকির আব্দুস সাত্তার | - | সিঙ্গাপুর |

**তত্ত্বাবধানে ঃ** সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্



আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com


*সম্পাদকীয়*

## সালানা জলসা-২০০৩

বর্তমান বিশ্ব প্রবলভাবে অবক্ষয়ে আক্রান্ত। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়নই অবক্ষয়ের রোধ ও মানুষকে পাক পবিত্র করার আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ–সিরতে মুস্তাকীম। ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ সিরতে মুস্তাকীমের আহ্বানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সর্বশক্তিমান ও সর্বকরুণার আধার আল্লাহ্ ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদরূপে প্রেরণ করেছেন। সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম কর্মকান্ড হিসেবে তিনি ঐশী নির্দেশে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সালানা জলসার প্রবর্তন করেন কাদিয়ানে। মাত্র ৭৫ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে নিয়ে সেদিন যে জলসার শুভারম্ভ হয়েছিলো আজ তারই প্রতিচ্ছবিস্বরূপ এখন সারা বিশ্বের জামাতগুলোতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতি বছর। এতে হাজারের কোঠা পেরিয়ে এখন লক্ষ লক্ষ লোকও সমবেত হয়ে থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৭৯তম সালানা জলসার তারিখ ধার্য হয়েছে ৫-৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ইং। এ জলসায় যোগদানকারী মেহমানগণকে- যুগ-মসীহ্ (আঃ)-এর মেহমানগণকে আমরা জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। এ মহতি জলসা উপলক্ষ্যে আমরা পাক্ষিক আহমদীর বর্তমান সংখ্যাকে বর্ধিত কলেবরে পাঠকদের হাতে পৌছে দিতে পেরে ধন্য মনে করছি। বাংলার আনাচে-কানাচে থেকে অর্থ ও মূল্যবান সময় ব্যয় করে যেসব মোজাহেদীন এ জলসায় যোগদান করছেন তাদের কষ্ট ও শ্রম তখনই সার্থক হবে যদি তারা এ আধ্যাত্মিক জলসার উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রেখে এ দিন কয়টি অতিবাহিত করেন অর্থাৎ জলসার প্রত্যেকটি অধিবেশনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক খোরাক সম্বলিত বক্তৃতাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, শান্তি-শৃঙ্খলার সাথে ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতা করেন এবং সর্বোপরি দোয়ার মাঝে থেকে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দিনগুলো অতিবাহিত করেন। এ দিনগুলোতে আমাদের অবশ্যই আপোষে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সুদৃঢ় করার, বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করার এবং সর্বোপরি তবলীগের কাজকে বেগবান ও তরান্বিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে আমরা পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সকলের দুর্বলতা ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের জন্যে যে দোয়া করেছেন তা আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, আমীন।

## ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা বাণী

আসছে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ! হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মহান ত্যাগকে চির জাগরূক রাখার জন্যে আল্লাহ্তাআলা একে এক 'যবহে আযীম' অর্থাৎ মহান জবাইতে রূপান্তরিত করেন। আর আমরা তাই পশু জবাইর মাধ্যমে প্রতি বছর একে স্মরণ করে থাকি। আমাদের কুরবানী সকল লৌকিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে ঐশী প্রভায় সুষমামন্ডিত হোক এ কামনা করছি।

অনিবার্য কারণে ১৩ ও ১৪তম সংখ্যা বর্দ্ধিত কলেবরে একত্রে বের করা হচ্ছে। তাই ১৪তম সংখ্যা আলাদা বের করা সম্ভব হবে না বলে আমরা দুঃখিত।

-নির্বাহী সম্পাদক

# সূচীপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আস্ সাফফাত-৩৭ | ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে | ৩ |
| ■ হাদীস শরীফ ঃ যিক্‌রের মজলিসের ফজিলত | ঃ | ৪ |
| ■ অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী<br>হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) | ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ | ৪ও ৬ |
| ■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী | ৫-৬ |
| ■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য<br>মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন | ৭-৮ |
| ■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী | ৯-১০ |
| ■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত নূরের পূর্ণতা সাধন<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) | ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১১-১৩ |
| ■ পুস্তক পর্যালোচনা ঃ Islam's response to Contemporary Issues | ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ | ১৩ |
| ■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ | ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৪ |
| ■ সালানা জলসার ইতিবৃত্ত | ঃ জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ১৪-১৬ |
| ■ ঈদুল আযহার খুতবা ঃ কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী' (রাঃ) | ঃ | ১৭-১৯ |
| ■ পবিত্র কুরবানী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় | ঃ সংকলন - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ২০ |
| ■ পুস্তক পর্যালোচনা ঃ তবলীগে হক বা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহবান | ঃ জনাব খন্দকার আজমল হক | ২১-২৪ |
| ■ ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি | ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান | ২৫ |
| ■ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাতিল কারা? | ঃ জনাব সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী | ২৫-২৬ |
| নতুনদের পাতা ঃ | | |
| ● মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তার বংশের পরিণতি | ঃ জনাব এন, এ শামীম আহমদ | ২৭-২৮ |
| ● হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা | ঃ জনাব এহসানুল হাবীব (জয়) | ২৯-৩০ |
| ● হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সঠিক জন্ম তারিখ | ঃ মৌঃ আহমদ তারেক মুবাশ্বের | ৩০-৩১ |
| ● স্বাগতম ঈদুল আযহিয়া | ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম | ৩২-৩৩ |
| ● কুরবানীর গুরুত্ব ও ঈদ | ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন | ৩৩-৩৪ |
| ● আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব | ঃ মৌঃ শাহ্ আলম খান | ৩৫-৩৬ |
| ● কবিতা ঃ সাধু হৃদয়ের ব্যাকুলতা | ঃ মৌঃ নাসের আহমদ আনসারী | ৩৭ |
| ● পর্দা প্রগতির দিশারী | ঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল | ৩৮ |
| ■ সংবাদ | ঃ | ৩৯-৪০ |


প্রচ্ছদ ঃ ওপরে ঃ ইউকে সালানা ২০০২ ঃ হুযূর (আইঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। নীচে ঃ তারুয়া জলসায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ভাষণ দিচ্ছেন।

## হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার ঈমানবর্ধক ঘটনা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"ইহা সর্বৈব সত্য যাদের দোয়া গৃহীত হয় তাদের অধিকাংশ দোয়াই মন্থর হয়ে থাকে বরং বড় মু'জিয়া হলো তাদের দোয়ার গ্রহণীয়তা। যখন কোন বিপদ-আপদের সময় তাদের অন্তরে ভীষণ অস্থিরতা সৃষ্টি হয় আর এ ভীষণ অস্তিরতার অবস্থায় তারা খোদার প্রতি মনোনিবেশ করেন তখন খোদা ওগুলো শুনে থাকেন। আর সে সময় তাদের হাত যেন খোদার হাত হয়ে যায়। খোদা একটি গুপ্ত ভান্ডারের ন্যায়। যাদের দোয়া বেশি বেশি কবুল হয় তাদের মাধ্যমে তিনি নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেখিয়ে থাকেন। খোদার নিদর্শন তখনই প্রকাশিত হয়ে থাকে। যখন তাঁর গৃহীতগণকে কষ্ট দেয়া হয় এবং যখন সীমা ছাড়িয়ে তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয় তখন মনে করো খোদার নিদর্শন সন্নিকট। বরং দরজার নিকটে। কেননা, এটা সে জাতি যে, কেউ নিজের প্রিয় পুত্রকে এমনভাবে ভাল বাসবে না যেভাবে খোদা তাদের সাথে আচরণ করে থাকেন যারা মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর হয়ে যান। তিনি তাদের জন্যে

# কালামুল ইমাম

আশ্চর্য ধরনের কাজ দেখিয়ে থাকেন আর এমনভাবে নিজের শক্তি দেখান যেমন একটি ঘুমন্ত ব্যঘ্র জাগ্রত হয়। খোদা গুপ্ত। এসব লোকই তাঁকে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি হাজার হাজার পর্দার অভ্যন্তরে আছেন আর তাঁর মুখচ্ছবি এ জাতিই দেখিয়ে থাকেন" (হাকিকাতুল ওহী পৃষ্ঠা ১৮-১৯, রূহানী খাযায়েন, ২২ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০-২১)।

এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের দোয়াগুলো উপস্থাপন করা যাচ্ছে ঃ

### পাপ থেকে ক্ষমা লাভের বিনীত দোয়া

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবের পুত্রের ইনতেকালের পরে একটি শোক-বার্তা পাঠান (আগষ্ট ১৮৮৫)। "এ দোয়ার প্রতি চূড়ান্ত বিনয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে তিনি লিখেন ঃ "এই দোয়া এ অধমের রীতির অন্তর্ভুক্ত। আর প্রকৃতপক্ষে এ অধমের অবস্থাও এটাই।" তদুপরি লেখেন ইহা সমীচীন যে, সময় সুযোগ মত এ দোয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করে পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে নিজের পাপ স্বীকার করে পূর্ণ অভিভাবকের সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে স্বীকৃতি লাভ করে। কেননা, কেবল মুখ দিয়ে পাঠ করাতে কোন কাজ দেয় না। অন্তরের আবেগ প্রয়োজন। আর নম্রতা ও আকুতি-মিনতিও। দোয়ার পদ্ধতি হুযূর (সঃ) এই বর্ণনা করেন ঃ "রাতের শেষ প্রহরে ওঠো। আর ওযূ করো ও দু'চার রাকাআত নামায পড়ে আর ব্যথা ও বিনয়ের সাথে এ দোয়া করো ঃ

"হে আমার অনুগ্রহশীল ও আমার খোদা! আমি তোমার এক অযোগ্য দাস। পাপ ও অমনোযোগিতায় নিমজ্জিত। তুমি আমার মধ্যে অন্যায়ই অন্যায় দেখেছো এবং পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছো এবং পাপের পর পাপ করতে দেখেছো অথচ অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছো। তুমি সর্বদা আমার পাপকে ঢেকে রেখেছো আর নিজের অগুণতি কল্যাণ দ্বারা আমাকে ভরে দিয়েছো। সুতরাং এখনও আমার মত অযোগ্য ও পাপাচারীর প্রতি করুণা করো আর আমার ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা ক্ষমা করো। আর আমাকে আমার এ পাপ থেকে ক্ষমা মুক্তি দাও। কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী নেই, আমীন সুম্মা আমীন (তাই যেন হয়) (মকতুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, নম্বর ২ পৃষ্ঠা ৩)।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

## সূরা আস্ সাফ্ফাত - ৩৭

### ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানীর বিবরণ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। (সে বলল,) 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সৎ-কর্মশীলদের মধ্য থেকে (উত্তরাধিকারী) দান কর।'

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠٢﴾

১০২। তখন আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। অত:পর যখন সেই পুত্র তার সঙ্গে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হলো তখন সে বললো, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি;[২৪৯৭] সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কী অভিমত'? সে বললো, 'হে আমার পিতা! যা তোমাকে আদেশ দেয়া হয়, তা-ই কর; ইনশাআল্লাহ্ তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।'

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٤﴾

১০৪। অত:পর যখন তারা উভয়ই (আল্লাহ্র সমীপে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে জবাই করার জন্য কপালের উপর উপুড় করে শোয়ালো;

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٥﴾

১০৫। তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইব্রাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই (যথাযথ) পূর্ণ করেছ'। নিশ্চয় আমরা এরূপেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٧﴾

১০৭। নিশ্চয় ইহা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮।এবং আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে রক্ষা করলাম[২৪৯৮]।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করলাম।[২৪৯৯]

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١١٠﴾

১১০। ইবরাহীমের উপর সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক)!

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১। এরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের মু'মিন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

---

২৪৯৭। আল্লাহ্তাআলার আদেশক্রমে ইব্রাহীম (আঃ) কাকে কুরবানী রূপে পেশ করেছিলেন- ইসমাঈলকে না ইসহাককে- এই বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন ইসহাক (আঃ) (আদি পুস্তক-২২-২)। এই ব্যাপারে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে 'আব্রাহাম'কে আদেশ করা হয়েছিল, তাঁর একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করতে, কিন্তু ইসহাক (আঃ) কোন কালেই তাঁর একমাত্র সন্তান ছিলেন না। ইসহাকের (আঃ) চাইতে ইসমাঈল (আঃ) ১৩ বৎসরের বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র পুত্র হিসাবে তিনি পিতার কাছে অত্যধিক আদরের ছিলেন। অতএব, এটাই যুক্তি-যুক্ত যে, আল্লাহ্তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র, একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়েছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের কেউ কেউ অনর্থক বলে থাকেন, ইসমাঈল দাসীর পুত্র হওয়াতে তাঁর মাঝে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল এবং ইসহাক স্বাধীনা রমনীর সন্তান হওয়াতে, তিনিই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (গালাতীয় ৪ঃ২২-২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে, হযরত ইসমাঈলের মা হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখতে পাই হযরত ইসমাঈলকে বারংবার ইব্রাহীমের (আঃ) পুত্র বলা হয়েছে, যেরূপ ইসহাককে (আঃ) বলা হয়েছে (আদি পুস্তক -১৬ঃ১৬, ১৭ঃ২৩, ২৫)। তাছাড়া একই ধরনের 'বিরাট-ভবিষ্যতে'র প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইসমাঈল ও ইসহাক উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক-১৬ঃ১০, ১১, ১৭ঃ২০)।

বাইবেলে 'মারওয়া' পাহাড়কে 'মোরিয়া' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইসমাঈল নামের স্থলে ইসহাক বসানো হয়েছে। 'মারওয়া' মক্কার অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্রাহীম (আঃ) তদীয় শিশু-পুত্র ইসমাঈলসহ হাজেরাকে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ছেড়ে গিয়াছিলেন। 'মারওয়া' স্থলে 'মোরিয়া' আর ইসমাঈলের স্থলে ইসহাক এই দু'শব্দ বদল ব্যতীত বাইবেলে সমর্থনের নিমিত্ত আর এমন কিছু নেই, যা দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, ইসহাকই ছিলেন কুবানীকৃত পুত্র, ইসমাঈল নন। প্রনিধানযোগ্য বিষয় হলো ইসহাককেই কুরবানী দেয়া হয়েছিল বলে ইহুদী ও খৃষ্টানরা মনে করলেও তাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এতবড় একটা ঘটনার কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না। তারা যা বলে তা যদি সত্যই হতো তাহলে তারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্মৃত হতো না; কোন না কোনভাবে তা ধর্মাচারে জাগরূক রাখতো। অপর দিকে, হযরত ইসমাঈলের আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানেরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে, ইসমাঈলের ঐ কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করে যিলহজ্জ মাসের দশম দিনে সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া জাগিয়ে তুলে। মুসলমান কর্তৃক গরু, দুম্বা ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এ সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের উর্ধ্বে এবং এটা প্রমাণ করে যে, হযরত ইব্রাহীম কুরবানীর জন্য, ইসহাককে নয় বরং ইসমাঈলকে পেশ করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করতে হয় নি, যদিও তিনি ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আক্ষরিকভাবে তা পালন করতেই ইসমাঈলকে মক্কার ধু-ধু উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছেড়ে গিয়েছিলেন।

এই যে বীরত্বের কার্য, এরই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানী। প্রথমে ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্র এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর ঠিক মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম! হুকুম পালন করা হয়ে গেছে- এ দু' নির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, এখন থেকে মানুষ কুবানী নিষিদ্ধ করা হলো। কেননা, সেকালে এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

২৪৯৮। ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে। আয়াতটি থেকে আরও বুঝা যায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলে দেয়া হলো।

২৪৯৯। এর চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যের আর কী হতে পারে যে, তিন তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁকে আপন পিতৃপুরুষ বলে গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হলো, ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম।

## হাদীস শরীফ

### যিক্‌রের মজলিসের ফযিলত

♦ হযরত আবূ হুরায়রা রাযি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র একদল ফিরিশ্‌তা আছে, তারা পথে পথে আল্লাহ্‌র স্মরণেরত লোকদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র স্মরণেরত একদল লোককে পেয়ে যায়, নিজেদের সাথীদেরকে ডেকে বলে ঃ তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফিরিশ্‌তারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানার সাহায্যে তারা দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত ঐ স্মরণকারীদেরকে ঢেকে নেয়। তাদের রব্ব তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন ঃ আমার বান্দারা কী বলছে? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ তারা তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে, তোমার প্রশংসায় মশগুল রয়েছে এবং তোমার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করছে। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, তারা তোমাকে দেখে নি। আল্লাহ্ বলেন ঃ যদি তারা আমাকে দেখে নেয় তাহলে? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তোমার অনেক বেশি ইবাদত করতো, তোমার অনেক বেশি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতো এবং অনেক বেশি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কী চায়? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কি জান্নাত দেখেছে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয়ঃ না আল্লাহ্‌র কসম! হে আমাদের রব! তারা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা তা দেখে নিতো তাহলে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয়ঃ যদি তারা জান্নাত দেখে নিতো, তাহলে তাদের জান্নাতের লোভ, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও এর প্রতি আকর্ষণ আরো অনেক বেশি বেড়ে যেতো। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ তারা কোন্ জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তখন ফিরিশ্‌তারা জিজ্ঞেস করেন! তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, তারা জাহান্নাম দেখে নি। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নিত তাহলে? তিনি বলেন, ফিরিশ্‌তারা জবাব দেয় ঃ যদি তারা জাহান্নাম দেখে নিতো তাহলে তা থেকে আরো বেশি দূরে ভাগতো এবং এর ভয়ে আরো বেশি ভীত হতো। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তিনি বলেন, এ কথা শুনে ফিরিশ্‌তাদের একজন বলে ঃ এদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আসলে এদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কোন প্রয়োজনে এসে পড়েছে। আল্লাহ্ জবাব দেন ঃ এরা এমন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট যার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের বঞ্চিত করা হয় না (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

♦ হযরত আবূ হুরায়য়া ও আবূ সাঈদ রাযি আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দল নেই যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকে এবং ফিরিশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে নেয় না, তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত দিয়ে ঢেকে দেয় না এবং তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করে না আর্ তাঁর কাছে যারা থাকে তাদের সাথে আল্লাহ এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন না (মুসলিম)।

## অমৃতবাণী

## হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

### চশমায়ে মসীহী

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আবার একথাও ভেবে দেখুন অনন্ত কাল হতে খোদার প্রাকৃতিক নিয়ম এই, তওবা, অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করেন; পুণ্যবানগণের শাফায়াত ও বিশেষ অনুরোধের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন; কিন্তু আমরা কখনও খোদার এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম দেখি নি যে, খালেদের মাথায় পাথর মেরে বকরের মাথা বেদনা দূর হয়ে যায়। অতএব আমরা বুঝতে পারি না, এটা মসীহের আত্মহননে পরের অভ্যন্তরীণ রোগ দূরীভূত হওয়ার কথা কোন্ নিয়মের উপর সংস্থাপিত এবং কোন্ দার্শনিক সত্যের বলে ঈসা মসীহের রক্তে পরের অভ্যন্তরীণ কলঙ্ক ও কালিমা দূরীভূত হবে? বরং আমরা প্রতিকূল রীতিই দেখতে পাই। কেননা, যতদিন মসীহ্ আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেন নি ততদিন খ্রীষ্টান সমাজে সদাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনার বীজ বর্তমান ছিল; কিন্তু ক্রুশের পর হতে খ্রীষ্টানগণের অহমিকাস্রোত বাঁধভাঙ্গা নদীর ন্যায় চারিদিকের পার ডুবিয়ে চলেছে। মসীহ্ যদি এ আত্মহত্যা আপন ইচ্ছায় করে থাকেন তবে যে তিনি অতিশয় অন্যায় কাজ করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই; যদি এ জীবন বক্তৃতা করে ও উপদেশ দিয়ে কাটাতেন তবে খোদার সৃষ্ট-জীবগণের উপকার করতেন, এ অসঙ্গত ধৃষ্টতায় কি পরোপকার হয়েছে? অবশ্য মসীহ যদি আত্মহননের পর জীবিত হয়ে ইহুদীদের সম্মুখে সশরীরে স্বর্গারোহণ করতেন তবে ইহুদীগণ এতেই বিশ্বাস করত, কিন্তু এখনও ইহুদীদের মতে ও সকল বুদ্ধিমানগণের মতে ঈসার আকাশারোহণ শুধু কাল্পনিক গল্পমাত্র। আবার ত্রিত্ববাদও এক অদ্ভুত বিশ্বাস। কেউ কখনও শুনেছে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সম্পূর্ণ জিনিস তিন হয় আবার একও হয় এবং এক পূর্ণ-খোদা তিন পূর্ণ-খোদা হয়? খ্রীষ্ট-ধর্ম ও এমন অদ্ভুত ধর্ম যে, এর প্রত্যেক কথায় ভ্রম ও প্রতি বিষয়ে অপলাপ বিদ্যমান। আবার এক আঁধার সত্ত্বেও ভবিষ্যতের জন্য ওহী ও ইলহামকে একবারে মোহর করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন ইঞ্জীলে ভ্রান্তিসমূহের মীমাংসা ঈসায়ীদের বিশ্বাস মতে নূতন ওহী ও ইলহাম দ্বারা অসম্ভব। কেননা, তাদের বিশ্বাস মতে কোন ওহী ভবিষ্যতে নেই। সব অতীত হয়ে গেছে। এখন সম্পূর্ণ ভরসা শুধু আপন আপন রায়ের উপর। যদিও এ রায় অজ্ঞতা, সন্দেহ ও অন্যান্য কালিমা হতে মুক্ত নয়। তাদের ইঞ্জিল অগণিত জ্ঞান-বিরুদ্ধ ও

*(অবশিষ্টাংশ ৬-এর পাতার পর)*

# আল্লাহ্‌র নূর সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৩ আগস্ট, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পরে সূরা হাদীদ-এর ১০নং আয়াত পাঠ করে হুযূর খুতবা এরশাদ করেন।

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ①

অনুবাদ ঃ তিনিই তাঁর বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল করেন, যেন তিনি এর দ্বারা তোমাদেরকে অন্ধকাররাশি হতে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। এবং তিনি নিশ্চয় তোমাদের প্রতি অতি মমতাশীল এবং বারবার কৃপাকারী।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত লোকমান হাকীম নিজ পুত্র সন্তানদেরকে ওসীয়্যত (অন্তিমকালের জরুরী উপদেশ) করতে গিয়ে বলেছেন, হে আমার প্রিয় পুত্ররা! আলেমদের মজলিসে বসার অভ্যাস কর, তাদের কাছে নতজানু হয়ে বসবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা নূর ও হিকমত (প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা) দিয়ে এভাবে মানব-হৃদয়কে জীবন দান করেন যেভাবে তিনি মৃত ভূমিকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করেন" [মুআত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল জামে']।

আল্লামা শাহাবউদ্দীন আলুসী সূরা হাদীদের উপরোক্ত আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের নূরের দিকে নিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে" (রূহুল মা'নী)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে মানবজাতিকে ভাগ্যবান ও হতভাগ্য দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তাদেরকে সুন্দর ও বিশ্রী দু'ভাগে বিভক্ত করেন নি। এর মধ্যে হিকমত ও প্রজ্ঞা এই যে, আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে যা ঘটেছে তাকে মন্দ বলা যায় না। কারণ তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সব কিছুই ভাল। হ্যাঁ, ভালর মধ্যে আবার স্তর বিন্যাস রয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি ভাল হবার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব অল্প অংশের অধিকারী সে সিদ্ধান্তের দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে মন্দ কিছু

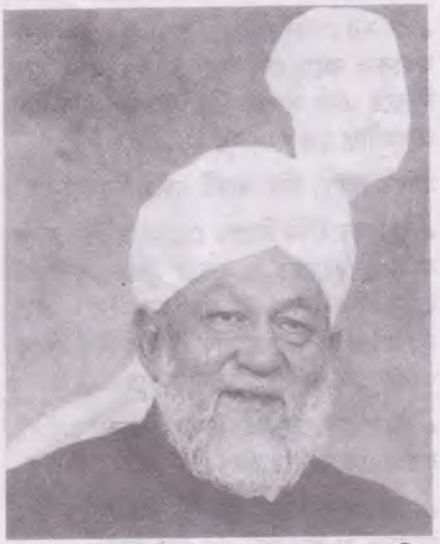

করে না। আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমার সৃষ্টির দিকে দেখ, তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে মন্দ কিছু দেখছ? অতএব কোন অন্ধকার আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হতে পারে না। বরং যে কেউ আলো (নূর) থেকে দূরে সরে গেছে সে অন্ধকারের মধ্যে বলে গণ্য হয়েছে। বাবা গুরুনানক সাহেবের গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এবং তার বর্ণনাগুলো কুরআন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তিনি কেবল নিষ্প্রাণ বাণী নকল করেছেন তা নয়। বরং সত্যের পয়গাম শুনে তাঁর আত্মা বলে উঠেছিল যে, এটাই সত্য! তারপর এ প্রেরণা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রকৃতির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে তিনি বলেছেন। বাবা গুরু নানক সাহেব অবশ্যই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। যদি তিনি সে রকম বিশ্বাস রাখতেন তবে একথা বলতেন না যে, প্রত্যেক বস্তুকে খোদা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র নূর থেকে সৃষ্টি হয় নি এমন কোন কিছু নেই। স্মরণ রাখা দরকার যে, বাবা সাহেব নিজ বাণীতে কুরআনী আয়াতের প্রতি ইশারা এবং তাঁর নূরের সাহায্যেই এসব কিছু চলমান এবং বর্তমান। এটাই সত্য ধর্ম যদ্বারা তৌহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এরই ফলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়, কোন বাধা থাকে না" (সতবচন-রূহানী খাযায়েন, ১০ খন্ড, পৃঃ ১৩৮-১৩৯, টীকা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আমি এ কথার সাক্ষী হয়েছি এবং সারা পৃথিবীর সামনে সাক্ষী প্রদান করছি যে, সেই সত্য যা মানুষকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে দেয় তা আমরা কুরআন থেকে পেয়েছি। আমরা সেই খোদার বাণী ও ধ্বনি শুনেছি এবং তাঁর শক্তিশালী বাহুর বহু নির্দেশন দেখেছি যিনি কুরআন নাযেল করেছেন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি যে তিনিই আসল খোদা, সারা জগতের প্রভু, মালেক। আমাদের হৃদয় এ বিশ্বাসে এভাবে পরিপূর্ণ যেভাবে সমুদ্রের মাটি পানিতে পরিপূর্ণ।

অতএব আমরা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে সকলকে এ ধর্মের দিকে এ আলোর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সেই প্রকৃত আলো বা নূরকে পেয়েছি যদ্বারা অন্ধকারের সকল আবরণ বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং হৃদয় থেকে গয়রুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ছাড়া বাকী সকলের) সমস্ত প্রভাব কেটে যায়। এটাই একমাত্র পথ যা দিয়ে একজন মানুষ নিজের জাগতিক মোহ বা আকর্ষণ ও অন্ধকার থেকে এভাবে বেরিয়ে আসে যেভাবে সাপ তার খোলস থেকে বেরিয়ে আসে" (কিতাবুল বারিয়্যা পৃঃ ৬৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"কুরআনের উচ্চ মর্যাদা সকল মর্যাদার উর্ধ্বে। এবং কুরআনই প্রকৃত বিচারক তথা সিদ্ধান্ত প্রদানকারী এবং পর্যবেক্ষণকারী বা সকল প্রকার হেদায়াতের সমষ্টি। এর মধ্যে সকল প্রকার যুক্তি-প্রমাণ, দলিল সন্নিবেশিত হয়েছে। এবং শত্রুদের জোটকে ভেঙ্গে চুরমার ও ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। এ এমন একখানা কিতাব যার মধ্যে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং এর মধ্যে ভবিষ্যতের এবং অতীতের অনেক খবর ও তথ্য বর্ণিত হয়েছে। মিথ্যা বা ভন্ডামির কোন পথ নেই এর কাছে যাবার না সামনে, না পেছন থেকে এবং এ তো আল্লাহ্‌তাআলার নূর" (খুতবা ইলহামীয়া। রূহানী খাযায়েন, ১৬তম খন্ড; পৃঃ ১০৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী নযমের কয়েকটি পংক্তির অনুবাদঃ

• আমি অন্তরের নূর দ্বারা কুরআনের নূরকে দেখেছি ফলে কুরআনের হাকীকত (প্রকৃত সত্য) আমার মধ্যে বিকশিত হয়েছে এবং এর মধ্যে মনোনিবেশ করে সব সময় আমি বিবেচনা ও চিন্তা করতে থাকি।

• হেদায়াতের জগতে এটি একটি সূক্ষ্ম রহস্য দূরের আকাশের তারার মত যার আলো সহজে দেখা যায় না।

• এ নূরের মত নূর মানুষের বুদ্ধির মধ্যে থাকতে পারে না। প্রকৃত সত্য এই যে, এ কিতাবের বিবরণ পড়েই তো মানুষের বুদ্ধি প্রখর ও উজ্জ্বল ও সুসজ্জিত হয় (কারামাতুস্ সাদেকীন)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ফার্সী নযমের কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ পেশ করছি,

• সেই চোখ যে কুরআন থেকে নূর আহরণ করে নি আল্লাহ্‌র কসম! সে সারা জীবন অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাবে না।

• সেই হৃদয় যে একে (কুরআনকে) বাদ দিয়ে ফুলের বাগানে আল্লাহ্‌কে খুঁজে বেড়ায়, খোদার কসম সে কখনও তাঁর গন্ধও পাবে না।

• আমি সূর্যের আলোর সাথে এর তুলনা করতে পারি না। কেননা আমি দেখি যে, তার আশে পাশে শত শত সূর্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

• সে সব লোক বড়ই হতভাগা ও দুর্ভাগা যারা অহংকার করে সেই নূর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করেছে (বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড; পৃঃ ২৮৯)।

হযরত (আঃ) তাঁর আরবী নযমে লিখেছেন,

• কুরআন যখন নিজের চেহারা প্রদর্শন করল যা নূরে, নূরান্বিত ও সুন্দরে সুন্দরে সুসজ্জিত তখন বিরোধীরা বুঝে গেল যে, তারা কুরআনের বিপরীতে ভাষা শৈলীর দিক থেকে অনেক পেছনে এবং বেহুদা বকছে।

• সমস্ত ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্‌তাআলা কুরআনকে বানিয়েছেন।

• এর হেদায়াতের নূর বড় উচ্চমার্গের নূরে নূরান্বিত যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

• যে ব্যক্তি কুরআনী নূরের অস্বীকারকারী আমি তার জন্যই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছি। [নূরুল হক প্রথম খন্ড]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর একটি দোয়া ঃ

"হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দেখছ, আমি কেমন অন্ধ এবং আমি এখন সম্পূর্ণ মৃত অবস্থায় আছি। আমি জানি, কিছু সময় পরে আমাকে ডেকে পাঠানো হবে তখন আমি তোমার কাছে চলে আসব। তখন কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারে না। কিন্তু আমার অন্তর তো অন্ধ হচ্ছে! তুমি আমার অন্তরের উপর এমন নূরের জ্যোতিঃ দাও তোমার প্রতি আকর্ষণ এর মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়ে যায়। তুমি এমন অনুগ্রহ আমার উপর অবতীর্ণ কর আমি যেন অন্ধ অবস্থায় তোমার কাছে উত্থিত না হই এবং অন্ধদের মধ্যে গিয়ে অন্তর্ভুক্ত না হই" (মলফূযাত ২য় খন্ড, পৃঃ ৬১৬ নতুন সংস্করণ)।

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

---

(অমৃতবাণীর বাকী অংশ)

বেহুদা কথায় পরিপূর্ণ। তারা বলে, ইঞ্জীলের মতে দুর্বল মনুষ্য যিশুই স্বয়ং পরমেশ্বর, পরের পাপে তিনি ক্রুশবিদ্ধ, তিন দিবস যাবৎ নরকে পরিত্যক্ত, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর অথচ বলহীন ও মিথ্যাবাদী। ইঞ্জীলসমূহে এসব কথা পাওয়া যায় যদ্দারা নাউযুবিল্লাহ্, হযরত ঈসা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন। তিনি এক চোরকে বলেছেন, "তুমি আজ স্বর্গে আমার সাথে ভোজন করবে" কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি সে দিন নরকে চলে গেলেন, তিন দিন অবিরত কঠোর নরক যাতনা ভোগ করলেন। শয়তান যিশুকে পরীক্ষা করতে কয়েক স্থানে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল। ইঞ্জীলে এ কথাও লিখিত আছে। আশ্চর্যের বিষয় স্বয়ং পরমেশ্বর হয়েও যিশু পাপ-পুরুষ শয়তানের পরীক্ষা হতে নিস্তার পেলেন না। শয়তান পরমেশ্বরকেও পরীক্ষা করতে ও বিপদগামী করতে সাহসী হ'ল? ইঞ্জীলের ফিলসফী-জ্ঞান সমস্ত পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ পৃথক। বাস্তবিক শয়তান তার সমীপে আগমন করে থাকতো তবে ইহুদীগণকে দেখিয়ে দিবার জন্য কি এটা এক মহা সুযোগ ঘটেছিল না ? মালাকী নবীর ধর্মগ্রন্থে আছে, মসীহ্ আবির্ভূত হবার পূর্বে ইলিয়াস নবী স্বর্গ হতে পৃথিবীতে পুনরাগমন (১) করবেন, এটাই মসীহের আগমনের নিদর্শন; কিন্তু ইলিয়াস নবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন না বলেই ইহুদীরা ঈসা নবীকে অস্বীকার করে এবং আজ তাঁকে ভণ্ড নবী, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলে নির্দেশ করে; এ প্রবল যুক্তির প্রতিবাদে খ্রীষ্টানগণ নিরুত্তর। ঈসার সমীপে শয়তানের আগমন সংবাদ ও তাদের মতে পাগলের মনের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নয়। পাগল এরূপ শয়তানের স্বপ্ন দর্শন করে, এটা কাবুস জাতীয় এক রোগবিশেষ। এক সমালোচক পন্ডিত শয়তানের আগমনের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন মসীহের সমীপে তিনবার শয়তানী ইলহাম (প্রত্যাদেশবাণী) অবতীর্ণ হয়েছিল; "তুমি পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আমার অনুচর হও"-এটাতো তার এক শয়তানী ইলহাম। সে এ কথা তাঁর অন্তরে ঢুকিয়ে দিল; ঈশ্বরপুত্রের উপরও শয়তান স্বীয় প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হ'ল এবং সংসারের প্রতি তাঁর হৃদয় আকৃষ্ট করতে সক্ষম হ'ল- এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ভাবাপন্ন হয়ে তিনি আবার মরেও গেলেন। পরমেশ্বরও কি কখনও মরেন? আর যদি শুধু মানুষই মরেন তবে ইবনে আল্লাহ্ (ঈশ্বরপুত্র) মানব জাতির উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করেছেন- এ দাবী কেন? ঈশ্বরপুত্র বলে কথিত হওয়া সত্ত্বেও পুনরুত্থান দিবস সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ রাখেন নি। তিনি বাইবেলে স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত কবে হবে তা তিনি অবগত নন; স্বয়ং পরমেশ্বরেরও পুনরুত্থান দিবসের জ্ঞান নেই- এটা কেমন অলীক ও অসঙ্গত কথা! রোজ কিয়ামত তো দূরের কথা, ডুমুর বৃক্ষের সমীপে গমনকালে উক্ত বৃক্ষ যে ফলহীন তা-ও তিনি জানতেন না।"

অনুবাদ- **মুহাম্মদ আজীম উদ্দীন**
চলিতকরণ ও সম্পাদনা-
**-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

(১) অধুনা আমাদের সাদাসিদে মোল্লা-মৌলবীগণ যেমন হযরত ঈসা আকাশ হতে অবতরণের অপেক্ষা করেন সেরূপ সে যুগের ইহুদীরা ইলিয়াস নবীর আকাশ হতে অবতরণের প্রতীক্ষা করত। হযরত ঈসা মালাকী নবীর সে ভবিষ্যদ্বাণী তা'বিল (রূপক ব্যাখ্যা) করলেন, তজ্জন্য ইহুদী জাতি আজও তাঁকে সত্য নবী মানে না। কেননা, ইলিয়াস আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় নি। এ বিশ্বাসের দরুনই ইহুদী সমাজ অধঃগামী হয়েছে। আজকাল মুসলমানও এ বৃথা আশার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ইহুদী রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছে। যা হোক এতে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

# ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

## মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ২ ঃ

অধ্যায় ঃ ২

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ত্রিপিটকের ২য় অংশ সূত্ত পিটকে বুদ্ধের বিশ্বাস সংক্রান্ত এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তক আবার ৫টি আলাদা রচনার সমষ্টি এবং প্রত্যেকটিতেই বুদ্ধের সংলাপ (Dialogue) হিসাবে বেশ কিছু কথোপকথন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লন্ডনের (Pali Text Society) বা পালিভাষায় রচিত পুস্তক সংঘের সভাপতি Mr. T. W. Rhys Davids এ ধরনের কিছু সংলাপের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, (Sacred Books of the Buddists) বা বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদি শিরোনামে সেসব পুস্তক প্রকাশ করেছেন। Tevigga Sutta নামের ২য় খন্ডের এরূপ একটি পুস্তকের ১৩নং সংলাপটিতে দেখি মানুষ কীভাবে ঈশ্বরমুখী হবে (How man can be led of God?) এ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন বুদ্ধের নিকট করা হয়। এর উত্তরে বুদ্ধ যেসব কথা বলেন, তাতে বুদ্ধের শিক্ষার অনেক সূক্ষ্ম দিক ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বুদ্ধ যে কথা বলেন- তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তার সময়ের কোন হিন্দু যাজক বা গুরু মানুষকে ঈশ্বরমুখী করার ক্ষমতা রাখেন না বলে বুদ্ধ মন্তব্য করেন। তারপর তার নিজের পদ্ধতিতে যুগ ও পটভূমিকে বিবেচনায় রেখে তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দেন। যে পটভূমি ও পরিস্থিতির বিবেচনায় এই সংলাপটি বলা হয়েছিল তার দিকে এখন দৃষ্টি ফেরানো যাক।

বলা হয় যে, এক সময় মানাসাকটা (Manasakata) নামে একটি ব্রাহ্মণ পল্লী ছিল, যা একটি নদীর তীরে খুবই সুন্দর একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বগত বিতর্ক ও বাদানুবাদের জন্য এর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঁচ ঘরানার ৫ জন ব্রাহ্মণ সেখানে বিশেষভাবে আলোচিত ছিলেন, কারণ তারা তাদের ধারায় ব্রাহ্মণ ধর্মের নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করতেন। ঘটনাক্রমে বুদ্ধ ও তাঁর কিছু অনুসারীসহ একদিন সেখানে উপস্থিত হন, এবং তাঁর খবর শুনে অনেকেই তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর নিজের মুখে ধর্ম-কথা শুনবার জন্য আসেন। ভাসেতথা (Visettha) এবং ভারদভাগা (Bharadvaga) নামে উক্ত গ্রামের দুই ব্রাহ্মণ সে সময় নদীতে গোসল শেষে একটি ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, এবং তাদের স্ব স্ব গুরুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্ত বিষয়ে কোন মতৈক্যে পৌছাতে ব্যর্থ হন। তাদের মধ্যে অল্প বয়সী ব্রাহ্মণের নাম ছিল ভাসেতথা এবং তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য তারা উভয়ে মহামতি বুদ্ধের শরণাপন্ন হবেন। প্রস্তাব মোতাবেক দু' জনই বুদ্ধের দ্বারস্থ হয়ে উক্ত বিষয়ে বুদ্ধের মতামত জানতে চান। বুদ্ধ সরাসরি উক্ত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভাসেতথার নিকট নীচের বিষয়গুলোর উত্তর জানতে চান ঃ

"তোমরা যারা তিন-বেদের শিক্ষায় পারদর্শী, তারা কি কখনো ব্রহ্মকে স্বচক্ষে দেখেছো? উত্তরে বলা হলো ঃ না। পুনরায় বুদ্ধ ভাসেতথাকে প্রশ্ন করলেন- তোমাদের আগের ব্রাহ্মণদের সাত পুরুষের মধ্যে কি কেউ ব্রহ্মকে দেখেছ? এবারেও বলা হলো ঃ না। তাহলে তারা কি কখনো দাবী করেছে যে, তারা ব্রহ্মকে দেখেছে? এ প্রশ্নের উত্তরেও বলা হলো ঃ না। তখন বুদ্ধ ভাসেতথার নিকট জানতে চান যে, কেউ যদি মানাসাকটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে বড় হয় সে কি অন্য কোন আগন্তুককে উক্ত গ্রামের সন্ধান দিতে কোন সমস্যা বা সংকোচের সম্মুখীন হবে?" ভাসেতথা উত্তরে বল্লেন ঃ "নিশ্চয়ই নয়, গৌতম, আর কেনই বা হবে? যে ব্যক্তি মানাসকটাতে জন্ম নিয়ে বড় হয় তার পক্ষে তো এর সমস্ত রাস্তা-ঘাট পরিচিত।" এ পর্যায়ে বুদ্ধ বললেন, "ঠিক তদ্রূপই ভাসেতথা, তথাগতের (অর্থাৎ পরিপূর্ণ আলোকিত ব্যক্তি, বুদ্ধ স্বয়ং) নিকট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পথ-ঘাট ও পরিচিত। এ সময়ে যদি ব্রহ্ম এবং তার নিকট পৌছার রাস্তা কেউ অনুসন্ধান করে, তাহলে একমাত্র আমিই এর সন্ধান দিতে পারি।"

বুদ্ধের উপরোক্ত সংলাপ থেকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, যে উদাহরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিচয় ও তার পথের সন্ধান কেমন করে পাওয়া যেতে পারে, বুদ্ধ সে কথাই উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়কে বলেছিলেন। কেননা, খোদাকে যে সঠিকভাবে জানে, সে-ই খোদার সন্ধান দিতে পারে। যে তাকে দেখে নি, তাকে চিনে না, তার পক্ষে খোদার রাস্তা দেখানো কখনো সম্ভবপর নয়। তদ্রূপ ব্রাহ্মণদের যেসব গুরু কখনো ব্রহ্মকে দেখে নি। অথবা তার স্বরূপ সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোন উপলব্ধিও যাদের নেই তাদের পক্ষে ব্রহ্মকে দেখার বা চেনার দাবীও বাতুলতা মাত্র। সম্ভবত সংলাপের এ পর্যায়েই বুদ্ধের ঈশ্বর সম্পর্কিত অস্বীকৃতির দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম লাভ করেছে। তার যুক্তিকে ভুল ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, যেহেতু ব্রাহ্মণরা বা তাদের গুরুরা কেউ ঈশ্বরকে দেখেন নি, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলে গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা বুদ্ধ অস্বীকার করেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরবর্তীতে বুদ্ধের শিক্ষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। অথচ যে অবস্থা বা পরিস্থিতির বিবেচনায় এ বিতর্কের শুরু বা সূচনা, তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। বুদ্ধের স্পষ্ট উক্তি, "ব্রহ্মের সাথে প্রকৃতই যদি তোমরা সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হও, যা না করার আগ্রহই বরং তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, তবে জেনে রেখ, আমার মাধ্যমেই সেটা অর্জন সম্ভব' (If you want union with Brahma which you had much better not want this is the way to attain to it)।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বুদ্ধ যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কথোপকথনের ভঙ্গিতে শিক্ষা দেবার জন্য ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণার কথা বলেছিলেন, তাকে ভুল বুঝে পরবর্তীতে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা গবেষকরা নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী বুদ্ধকে ঈশ্বরের অস্বীকারকারী হিসাবে পেশ করেছেন। অথচ বুদ্ধ যা অস্বীকার করেছেন তা ছিল তদানীন্তন হিন্দু ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন কুসংস্কার এবং বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস, যাদেরকে তারা কখনো দেখে নি, বা উপলব্ধির মাধ্যমেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয় নি। ঈশ্বর সম্পর্কে বুদ্ধের উত্তর সেখানেই থেমে থাকে নি। তিনি নিজেকে 'তথাগত' বলে দাবী করেছেন, যিনি ঈশ্বর থেকে প্রেরিত এবং এ ধারণাও দেন যে, ঈশ্বরকে পাবার পথ দেখানো তার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়। কেননা, যিনি ঈশ্বর থেকে প্রেরিত, ঈশ্বরের সাথে সদা যোগাযোগ রাখেন কেবল তিনিই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করার দাবী করতে পারেন। (He went on to claim that he himself was the one who could lead man to God because he had been in communion with Him and had come form Him।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এক মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি বুদ্ধের শুধু বিশ্বাসই ছিল না, বরং তিনি তাঁরই প্রেরিত বলে দাবী করেছেন। সেই সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের সাথে ছিল বুদ্ধের নিত্য সংযোগ (constant communion), এবং এমন নৈকট্য যা শুধু ওহী-ইলহাম লাভ থেকেও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্মানিত নবী ছাড়া এ ধরনের নিরন্তর সংযোগ ঈশ্বরের সাথে সাধারণ মানুষের হয় না। ঈশ্বরকে বুঝাতে বুদ্ধ 'ব্রহ্ম' নামেই উদ্ধৃত করেছেন, কেননা, তদানীন্তন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু ঈশ্বর বা দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হিসাবে 'ব্রহ্ম' নামটি স্বীকৃত ছিল। লক্ষ্যণীয় যে, সংলাপের শেষ অংশে ভাসেতথা বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে

পড়েন এবং ব্রহ্মকে পাওয়ার পথের সন্ধান দিতে তাকে অনুরোধ করেন। যেমন, "হে গৌতম, আপনি যেহেতু সেই পরম ব্রহ্মের পথের সন্ধান জানেন, অনুগ্রহ করে আমাদেরকে তাঁর সাথে সংযোগের ব্যবস্থা করুন, এ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আপনি বাঁচান (Let the venerable Gotama he pleased to show us the way to be 'state of union with Brahma let the venerable Gotama save the Brahman race)। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে ভাসেতথার অনুরোধ শুনে বুদ্ধ তাকে অলীক বা অর্থহীন কোন বিষয় বলে অস্বীকার করেন নি। এটা এ কথার সাক্ষ্য দেয়, ব্রহ্ম সম্পর্কে এবং তাঁর সাথে মানুষের সংযোগের সম্ভাবনাকে বুদ্ধ অবশ্যই স্বীকার করতেন, এবং তাই ভাসেতথার অনুরোধকে তিনি বিবেচনাযোগ্য বলেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

উপরোক্ত সংলাপটি যদি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তা'হলে ঈশ্বর সম্পর্কে বুদ্ধের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, সত্যিকার অর্থে খোদার ভয় বা তাকওয়াকে হৃদয়ে ধারণ করার ফলে মানুষ যে ধীরে ধীরে তার পশু-প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে, খোদায়ী সিফতের বিকাশ ঘটাতে পারে এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর সার্থক জীবন যাপনে সক্ষম হয়, তা-ও হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তাহলে প্রশ্ন জাগতে পারে, বুদ্ধকে কীভাবে তাঁর নিজ অনুসারীরাই ভুল বুঝেছে? এর উত্তর হয়ত সে যুগে বৌদ্ধ ধর্মের নব উত্থান এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরাতন বা রক্ষণশীল ধারার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্যের টানা পোড়েনের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিছু অনুসারী কর্তৃক নিজেদের ঝোঁক বা চিন্তা-ভাবনাকে বুদ্ধের ভাবগত উপাদান হিসাবে চালানো, অথবা ভাল ধারণাপ্রসূত ভুল-বুঝাবুঝি (misundertood him in good faith) থেকেও এটা সম্ভব হতে পারে। যোগাযোগের অপ্রতুলতা এবং লিখিত মাধ্যমের সীমাবদ্ধতার জন্য বুদ্ধের সঠিক বক্তব্য শুধু হিন্দুদের কাছে নয়, বুদ্ধের পরবর্তী যুগের বৌদ্ধদের নিকটও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় নি। যোগসূত্র ও সমন্বয়ের দুর্বলতার জন্যই তাই ব্রাহ্মণদের বহু ঈশ্বরকে অস্বীকার, আর প্রকৃত ঈশ্বরকে অস্বীকার এক হয়ে গেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের দৃঢ় অপপ্রচার এতটাই প্রচন্ডতা অর্জন করেছিল যে, সেই বিশৃঙ্খল বৈরিতার আবর্তে মহামতি বুদ্ধের কণ্ঠস্বর নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল (The voice of Budha was drowned in their tumultuous antagonism)। তবে বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধদের আনুগত্যের এতে কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় নি। বরং তারা তাকে এক মহাজ্ঞানী, দয়ালু, প্রেমময় শিক্ষক হিসাবে বরণ করে নেয়। যেহেতু সে যুগে শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটে নি, তাই জনশ্রুতি এবং ব্রাহ্মণদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে সাধারণ শ্রেণীর বৌদ্ধরা বুদ্ধকে নাস্তিকতার দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও মহাজ্ঞানী হিসাবে মেনে নেয়। কালক্রমে একদিন তাদের দৃষ্টিতে খোদাকে অস্বীকারকারী এ বুদ্ধই স্বয়ং খোদাতুল্য সত্তায় পূজিত হতে থাকে।

তবে এটা ধর্মের ইতিহাসে কোন নূতন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী অনেক ধর্মে দেখা গেছে যে, ভক্ত বা অনুসারীদের বাড়াবাড়ির ফলে যাজকরা কালক্রমে দেবতা, বা মানুষের ঔরষে বা গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন সাধারণ মানুষও এক সময় ঈশ্বররূপে পূজিত হয়েছে। তবে বুদ্ধকে সেভাবে ঈশ্বর বলা না হলেও মানবিক গুণাবলী ও জ্ঞানে এর পরিপূর্ণ সত্তা হিসাবেই দেখা হয়েছে। তাই পৌরাণিক দেব-দেবী থেকে আলাদা এক অবস্থানে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে দাঁড় করালেও ব্রাহ্মণদের বিপরীতে জ্ঞান ও সত্যের মূর্তিমানরূপে বুদ্ধ পরবর্তীতে এক সময় অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বরের সমার্থক হয়ে পড়েন। এভাবেই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যে বুদ্ধ 'বোধিসত্ত' লাভ করার ফলে একজন পূর্ণ জ্ঞানী হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু করেন, সময়ের ধারাবাহিকতায় তিনিই একদিন তাঁর অনুসারীদের কাছে অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বরতুল্য সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিবর্তন একদিনে সংঘটিত হয় নি। খোদা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে খোদাহীনতার উদ্ভব হয়েছে। আবার খোদার অস্তিত্বে অস্বীকারকারী বুদ্ধকে খোদাজ্ঞানে মানা ও এর প্রসার ঘটা, অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত ধারণা পর্যন্ত পৌছাতে হয়ত কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছে।

এ পর্যন্ত আমরা বুদ্ধের শিক্ষা ও বাণী সম্পর্কে যতটুকু তথ্য-নির্ভর আলোচনা করেছি সেই আলোকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বুদ্ধ (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন মনোনীত নবী, এবং একেশ্বরবাদী। তিনি অবশ্যই বহু ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিলেন (What he rejected was polythism)। একেশ্বরবাদিতার এ পর্যায়ে বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রায় ৩ শ' বৎসর পর্যন্ত বিরাজ করেছিল, এবং যা সম্রাট অশোকের সময় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। একথা হয়ত অনেকেরই জানা আছে যে, সম্রাট অশোক ছিলেন একজন মহান ও পরাক্রান্ত বৌদ্ধ-শাসক, যার বিশাল সাম্রাজ্য ভারতের বাইরে পুরো আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধ সম্পর্কে সম্রাট অশোকের সাক্ষ্য ও মতামত অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অশোক বুদ্ধকে একজন নবী বা অবতার হিসাবেই মান্য করেছেন, যিনি ঐশী বাণীর ভিত্তিতে তাঁর ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন, (who founded his teachings upon Divine religion) এবং অশোকের শিলালিপি আজো এর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

### সংসারত্যাগী হওয়া না বাস্তবতাকে এড়ানো?

বুদ্ধধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে বুদ্ধের জীবনের যে ঘটনা বা আদর্শকে সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়, তা এই যে, 'দারা পুত্র পরিবার' সকলের মায়া কাটিয়ে এ সংসার ত্যাগ করাটাই নাকি দুঃখ-কষ্ট নিবারণের প্রধান উপায়, আর এর মাধ্যমেই চিরন্তন শান্তি বা নির্বাণ লাভ ঘটে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মানব জীবনের যে কোন চাওয়া, পাওয়া স্বাদ বা আসক্তিই পরিত্যাজ্য। এটা মেনে নিতে হলে তো মানব-জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডই বাদ দিতে হবে! সম্পদ বা কাউকে পাওয়ার আশাও করা যাবে না। কেননা, সেটা যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে আমাদের আত্মা কষ্ট পাবে, আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হবো। তদ্রূপ কারো প্রতি হিংসা বা ঘৃণা করারও উপায় নেই। কেননা, এতে আমাদের মানসিক প্রশান্তি বিঘ্নিত হবে, এর ফলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সংসার বা বাস্তবতাকে এড়িয়ে সমস্ত প্রকার আকর্ষণকে বিসর্জন দিয়ে, পাপের পথ পরিহার করার যে সংগ্রাম শুরু হবে, তার পরিণতি কতটা সফল হওয়া সম্ভব?

কেননা, বৌদ্ধ মতে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে সব সময় সংগ্রাম করে যেতে হবে। আর এটা তো এক অর্থে হবে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আমার চোখ যা দেখতে চায়, কান যা শুনতে চায়, যা স্পর্শ করতে আমার ভাল লাগে, গন্ধ এবং স্বাদ নিতে যা আমার মন চায়- সবগুলোকেই যদি অস্বীকার করতে হয়, তাহলে মানবজীবনের উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হবে? বৌদ্ধ মত এভাবে সংসারের সব কিছুকে পরিত্যাগ করে মুক্তি পাওয়ার যে কথা বলা হয়, তা কতটুকু বাস্তবসম্মত? এটা তো এক ধরনের পলায়ণপরতা (Simply another name for escapism)। বৌদ্ধদের শিক্ষা অনুযায়ী তা হলে কি মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাটাই সমস্যা, আর মরে যাওয়াই তার সমাধান? (To live is the problem to die is the solution)।

আমরা বলতে চাই, রিপুকে নিয়ন্ত্রণ বা জয় করার কোন প্রচেষ্টা না করে সেগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করার প্রবণতা, জীবনকে স্তব্ধ বা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ারই এক উদ্যোগ। এটা হচ্ছে জীবনের প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী (চলবে)।

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

# বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

**(২১-০৫-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব অনুবাদকের দায়িত্ব পালন করেন)**

**প্রশ্ন নং ১ ঃ** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্ ওসীয়্যত পুস্তকে লিখেছেন, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, ইহা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। এখানে কেয়ামত বলতে কী বুঝিয়েছেন এবং আপনি যে আহমদীয়তের এক হাজার বছর বলেছেন তারপর কি সেই কেয়ামত আসবে?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** আমি মনে করি সেটি এক হাজার বছরের দিকে ইশারা করেছে। এটা হতেই পারে না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর থেকে যে খিলাফতের সূচনা হয়েছে তার ওপরে অধঃপতনের যুগ আসবে না। অধঃপতনের যুগ অবশ্যই আসবে। ইসলামের শিক্ষার ওপরেও ক্রমাবনতির যুগ এসেছে। আহমদীয়া খেলাফত ইসলামেরই একটি ধারাবাহিকতা। এর ওপরে অধঃপতনের যুগ আসবে না এটা হতেই পারে না। অবশ্যই অধঃপতনের যুগ আসবে।

**প্রশ্ন নং ২ ঃ** কুরআন শরীফের সূরা নিসার আয়াতে আছে-অর্থ ঃ আহলে কিতাব থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ মৃত্যুর পূর্বে এর (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু) ওপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখবে আর সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। দয়া করে বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলুন।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এটা নিঃসন্দেহে একটি বিতর্কিত বিষয়ক আয়াত। এতে অনেক মতভেদ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার জন্য এটি স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে মূল বিতর্কিত শব্দ হলো- **কাবলা মাওতিহী** অর্থাৎ তার মৃত্যুর পূর্বে সে অবশ্যই ঈমান আনবে। কার মৃত্যুর পূর্বে? ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে না আর কারও মৃত্যুর পূর্বে? আমি মনে করি একটি শব্দ উহ্য আছে। **কাবলা মাওতিহী** বলতে ঈসা (আঃ)-এর মান্যকারীর মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) -এর জাতি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে পথ - ভ্রষ্ট হবে না। তিনি মারা যাওয়ার পর তারা তাঁর পথ ছেড়ে দেবে। এটি থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা, তার মান্যকারীরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তার জাতির ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে তারা ভ্রষ্ট হয়েছে সুতরাং ঈসা (আঃ) মারা গেছেন এ আয়াতে এটা প্রমাণিত।

**প্রশ্ন নং ৩ ঃ** বলা হয়েছে, মাছির এক পাখায় বিষ আর অন্য পাখায় প্রতিশেধক থাকে। এ বিষয়টি দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** একথা বিজ্ঞান সম্মত। হাদীসে উল্লেখ আছে, মাছি যখন কোন স্থানে বসে তখন বাম ডানা ময়লায় ডুবিয়ে রাখে। ডান ডানা উঁচিয়ে রাখে। ডান ডানায় ময়লা লাগতে দেয় না।

**প্রশ্ন নং ৪ ঃ** ঢাকা থেকে প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর জনাব আহমদ তওফীক চৌধুরী সাহেব-এর প্রশ্ন পড়ে শুনানো হয়- আমরা জন্মদিন পালন করি না কিন্তু ১২ রবিউল আওওয়াল 'ঈদে মিলাদুন্নবী' যে করা হয় সে ব্যাপারটি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** সীরাতুন্নবী জলসা পুরোপুরিভাবে অন্য একটি বিষয়। সাধারণতঃ গয়ের আহমদীরা বলে থাকেন, রসূলে করীম (সঃ) ১২ই রবিউল আওওয়াল জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাটি প্রমাণিত নয়। যাহোক তারা এ দিনটি জন্ম দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন। আমরা সীরাতুন্নবী জলসা করি এবং মহানবী (সঃ)-এর গুণাবলীর চর্চা করি। আমরা যদি কিছুই না করতাম তো আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও বেশি খারাপ ও মিথ্যা কথা বলতো। তারা বলতো, আমরা তাঁকে মানি না। আমরা এ দিন তাই রসূলে করীম (সঃ)-এর পবিত্র জীবনী নিয়ে আলোচনা করে থাকি।

**প্রশ্ন নং ৫ ঃ** অ-আহমদীরা বলেন যখন আসল ইমাম মাহ্‌দী আসবেন তখন নিজে থেকে ঘোষণা করবেন না; কিন্তু মুসলমানরা নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে জোর করে তার হাতে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণ করতে শুরু করবেন। হুযূর এ বিষয় কী বলেন?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এ ধারণা একেবারে ভুল। যদি ইমাম মাহ্‌দী আবির্ভাবের পরে তিনি নিজে দাবীই না করবেন তো লোকে কি করে জানবে যে, তিনি এসে গিয়েছেন। মাহ্‌দী (আঃ) অবশ্যই দাবী করবেন। তারা যে কথা বলে তার কোন প্রমাণ কুরআন বা হাদীসে নেই।

**প্রশ্ন নং ৬ ঃ** অনেকে বলেন, আল্লাহ্ মানুষের স্বভাবে Music-এর প্রতি আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন। হুযূর কী বলেন?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** না, মানুষের প্রকৃতিতে Music সেভাবে কোন আবশ্যক উপাদান হিসাবে আল্লাহ্‌তাআলা রেখে দেন নি। আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে নযম গাওয়া হয়। আমাদের MTA নামক TV তেও নযম পড়া হয়। আমরা Music ব্যবহার করি না তবুও আমাদের MTA-এর জনপ্রিয়তা দিনদিন বাড়ছে। যারা Music -এর দিকে ঝুঁকে যায় তারা গানের কথাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না।

**প্রশ্ন নং ৭ ঃ** বিয়ের পূর্বে মেয়ের অভিভাবক যদি মেয়ের সম্মতি না নেয় তো সেই বিয়ে কি সিদ্ধ হবে?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** না, বিয়ের সময় মেয়ের সম্মতি নেয়া আবশ্যক। সে মুখে না বললে, মাথা নাড়িয়েও লজ্জার সাথে সম্মতি প্রকাশ করতে পারে। তার অভিভাবক কেবল নিজে নিজে এ সম্মতি দিতে পারেন না।

**প্রশ্ন নং ৮ ঃ** নামাযের ৩য় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর কুরআন শরীফের অন্য কোন সূরা পড়ি না কেন?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এটা মহানবী (সঃ)-এর সুন্নত। আমরা তাঁর (সঃ) অনুসরণ করি। নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে আঁ হযরত (সঃ) সূরা ফাতিহার সাথে কোন সূরা পাঠ করেন নি।

**প্রশ্ন নং ৯ ঃ** পোষ মানানো সম্বন্ধে হুযূরের মতামত কী?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হ্যাঁ, এ কাজ করা বৈধ। কিন্তু আমি কুকুর না রাখাই ভাল মনে করি। তুমি পাখি পুষতে চাইলে পুষতে পার।

**প্রশ্ন নং ১০ ঃ মানুষ নানা রঙ্গের কেন?**

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** বিভিন্ন রঙ্গের মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌তাআলা সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই যদি একই রঙ্গের হ'ত তাহলে মানুষ নানা প্রকার মনস্তাত্বিক রোগের শিকার হত। মানুষ যাতে পরস্পরের পরিচিত হতে পারে সেজন্যেও এত রঙ্গের বা বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। কুরআন শরীফে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন নং ১১ ঃ 'ইরহাস্' শব্দের অর্থ কী?**

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এ আরবী পরিভাষা (Term)। এর অর্থ হচ্ছে পূর্ব সংবাদদাতা এমন কোন ব্যক্তি যে খবর দেয় যে, তার পরে এক মহাপুরুষ বা নবী আসবেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে John the Baptist এসেছিলেন। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পূর্বেও জনাব সাইয়্যেদ আহমদ বারেল্‌ভী সে রকম খবর দিয়েছিলেন।

**প্রশ্ন নং ১২ ঃ** অনেক ভদ্রলোক আছেন যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেন কিন্তু ধর্মের অনুশাসন মানতে চায় না। এর কারণ কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** আমি বলতে পারি না তারা কেন মানতে চায় না। এটা তারাই বলতে পারবেন। এ ধরনের লোক মুনাফিক বা কাফিরের পর্যায়ে পড়ে। এদের সৎসাহসের খুবই অভাব থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা মুনাফিকদেরকে পসন্দ করেন না। তাদের পরিষ্কারভাবে বলা উচিত তারা কী বিশ্বাস করে আর কী করে না। তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না।

**প্রশ্ন নং ১৩ ঃ** পবিত্র কুরআনে এক জায়গায় হযরত যাকারিয়্যার স্ত্রী সম্পর্কে রয়েছে- আমরা তার জন্য তাঁর স্ত্রীকে আরোগ্য দান করলাম। প্রশ্ন হচ্ছে 'তার জন্য' বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এখানে বুঝানো হয়েছে, হযরত যাকারিয়্যা (আঃ)-এর স্ত্রীকে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর জন্যে ভাল করে দিয়েছিলেন। হযরত যাকারিয়্যা পুণ্যবান ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাঁর ওপর দয়া পরবশ হন। তাদের এক সন্তানও হয়েছিল। এটা ছিলো তার দোয়ার দরুন।

**প্রশ্ন নং ১৪ ঃ** আমাদের জামাতে নযম পড়ার রীতি কবে থেকে চলে আসছে?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় থেকেই আমাদের জামাতে নযম পড়া হচ্ছে। লোকেরা তাঁর (আঃ) সামনে নযম পড়তেন- এটি নিয়ে তারা গর্ব করতেন। স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একবার স্বরচিত নযম পড়েছিলেন আওয়ায আ রাহি হ্যা ইয়ে ফনোগ্রাফ সে অর্থাৎ ফনোগ্রাফ থেকে আওয়ায আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়ে তাঁর আওয়াজ রেকর্ড করা হয় নি।

**প্রশ্ন নং ১৫ ঃ** কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে কেন?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** এজন্যে যে, কাক যেন বসে তা দেয় আর বাচ্চা ফুটে। কোকিল খুব চালাক। কাক প্রথমে বোঝে না। বড় হলে যখন ডাক শোনে তখন বুঝতে পারে এটা কাক নয় কোকিল। দেখতে কিন্তু কাক আর কোকিলের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।

**প্রশ্ন নং ১৬ ঃ** কুরআন শরীফের সূরা আশ্ শামসের ৮ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন- **ওয়া নাফাসীওয়ামা সাওয়াহা**-এর অর্থ কী?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** 'ওয়া নাফসীন' অর্থাৎ নফসের কসম। সাওওয়াহা অর্থাৎ নফসকে আল্লাহ্‌তাআলা পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করে এবং ভারসাম্য করে সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্‌তাআলা নফসের কসম খেয়ে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই যে, নফসকে সুঠাম ও পূর্ণাঙ্গ করেছেন এটা এমনিতেই হয় নি। এর একজন স্রষ্টা আছেন যিনি একে এভাবে সৃষ্টি করেছেন।

**প্রশ্ন নং ১৭ ঃ** ইদানিং 'উলকি' আঁকার দিকে মানুষের বেশ ঝোঁক দেখা যায়। ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** ইসলাম এটা পসন্দ করে না। কৃত্রিমতা ইসলাম পসন্দ করে না। মিছামিছি কিছু এঁকে আসলকে ঢেকে ফেলা এক বড় ধরনের কৃত্রিমতা।

**প্রশ্ন নং ১৮ ঃ** এ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন এবং পরকালের জীবন-এর মধ্যে মিল আছে কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** অবশ্যই। এ পৃথিবীর আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে পরকালের জীবনের মিল থাকবে। তবে পরবর্তী জীবন আরও আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেবে।

**প্রশ্ন নং ১৯ ঃ** আজকাল পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে হুযূর (আইঃ)-এর মতামত জানতে চাই।

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে যুদ্ধ এড়ানোর জন্যে তৃতীয় বিশ্বের অনেকেই চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় না যে, যুদ্ধ এড়ানো যাবে। বিশেষ করে সিয়ালকোটে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

**প্রশ্ন নং ২০ ঃ** আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে জানি তিনি হচ্ছেন 'খলীফাতুর রসূল' অপরদিকে সহীহ্ হাদীসে তাঁকে 'খলীফাতুল্লাহিল মাহ্‌দী'-ও বলা হয়েছে। এ দু'টি বিষয়ে পরিভাষাগত মিল বা পার্থক্য কি?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** খলীফাতুল্লাহ্ আল্ মাহ্‌দী অর্থাৎ তিনি নবী হবেন এবং নাম হবে আল্ মাহ্‌দী বা প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী।

**প্রশ্ন নং ২১ ঃ** সূরা আল্ ফালাকের ২য় আয়াতে বলা হয়েছে- তুমি বল, আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই। এখানে প্রভাতের প্রতিপালক বলতে কী বুঝিয়েছেন?

**হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ** 'ফালাক্' অর্থ কোন কিছুকে খুলে দেয়া বা কোন কিছুর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। রব্বুল ফালাক্ আল্লাহ্‌তাআলার একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার অর্থ হলো এমন প্রভু যিনি কোন কিছুকে খুলে দেন বা উন্মুক্ত করেন। ফালাকের অনুবাদ করা হয়েছে প্রভাত আর হুযূর বলছেন, কোন কিছুকে যিনি উন্মুক্ত করেন বা খুলেন। আর **মিন শার্‌রে মা খালাক্**- তার অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এমন প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি যিনি অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মাঝে নেতিবাচক দিকও থাকে। সেই নেতিবাচক দিক থেকেও প্রভুর আশ্রয় চাচ্ছি। **মিন শার্‌রে গাসিকিন ইযা ওয়াকাব**- 'গাসিক' বলা হয় এমন ক্ষতিকর দিক যা কোন কিছুকে ঢেকে ফেলে। এখানে রাতের দিকে ইশারা। কুরআন শরীফের অন্য স্থানে **ইযা ওয়াসাক** বলে রাতের অনিষ্ট থেকেও আমি প্রভুর আশ্রয়ে আসছি। রাতের অন্ধকার যখন ছেয়ে যায় তখন এর মধ্যে অনেক অনিষ্ট থাকে। এ থেকেও আমি প্রভুর আশ্রয় আসছি। **মিন শাররিন্ নাফফাসাতে ফিল উকাদ**- আর যারা বন্ধনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে চায়, সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা ফাটলের সৃষ্টি করে তাদের ফুৎকার থেকে আমি প্রভুর আশ্রয় আসছি। **মিন শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ**- হিংসুকের দেখে আমি প্রভুর আশ্রয় আসছি যখন সে হিংসা করে। এতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি দেখে অনেকেই হিংসায় জ্বলবে। তাদের অনিষ্ট থেকে এখানে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

সংকলন - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

# আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত নূরের পূর্ণতা সাধন

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৬ জুলাই, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌আআলার গুণবাচক নাম আন্ নূর বিষয়ক আজ জুমুআর এ খুতবার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইংল্যান্ডের (আন্তর্জাতিক) সালানা জলসার উদ্বোধনও হতে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে বিগত কয়েক খুতবায় আল্লাহ্‌র এ গুণটির বিষয় আলোচিত হয়েছে, আগামীতেও যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন হতে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা সূরা আস্ সাফের ৯ম আয়াতে বলেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ, তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র নূরকে নিবিয়ে দিতে চায় অথচ আল্লাহ্ তাঁর নূরকে সর্বতঃ পূর্ণ করে ছাড়বেন যদিও অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করুক তবুও।

হযরত যোহরী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁকে হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) অবহিত করেন, হযরত উমর (রাঃ) যে খুতবা আঁ হযরত (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরের দিন মিম্বরে বসে প্রদান করেছিলেন তা হযরত আনাস সরাসরি শ্রবণ করেন। আঁ হযরত (সঃ) -এর ইন্তেকালের পর এ ছিল দ্বিতীয় খুতবা। (ইতিপূর্বে হযরত আবূ বকর প্রথম খুতবা দিয়েছিলেন)। [হুযূর (আইঃ)বলেন,] বসে খুতবা প্রদান হযরত উমর (রাঃ)-এর সুন্নত। তদনুযায়ী আমিও আজ বসেই খুতবা দিচ্ছি।

(হযরত আনাস বর্ণনা করেন) হযরত উমর (রাঃ) তাশাহ্হুদ পাঠ করেন। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) বল্লেন, "আমার আশা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বেঁচে থাকবেন এবং আমাদের সবার পরে মারা যাবেন। **কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ) মারা গেলেও আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের মাঝে এমন নূর (জ্যোতিঃ) রেখে দিয়েছেন যার মাধ্যমে তোমরা হেদায়াত পেতে থাকবে।** আল্লাহ্‌তাআলা মুহাম্মদ (সঃ)-কে উত্তম পথ-নির্দেশনা (হেদায়াতের উত্তম উপায় -উপকরণ) প্রদান করেছিলেন। কেননা, আবূ বকর (রাঃ) রসূল করীম (সঃ)-এর সাথী এবং গুহায়ও তাঁর সঙ্গে (অবস্থানকারী) দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কাজেই তিনি নিশ্চয় তোমাদের

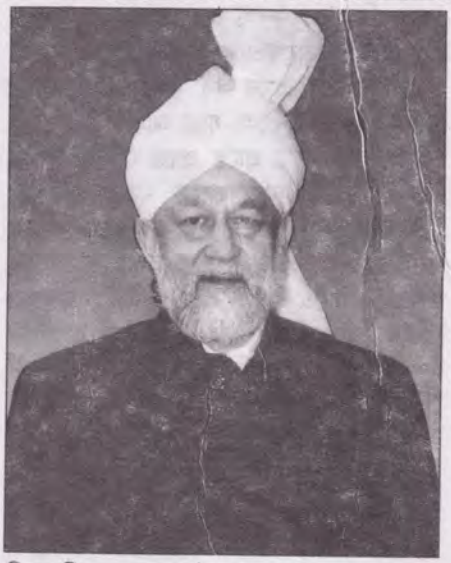

বিষয়াদির সম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে যোগ্যতম ব্যক্তি। অতএব ওঠো এবং তাঁর নিকট বয়াত হও।" ইতিপূর্বে সাকীফা বনি সায়েদায় [হযরত আবূ বকর (রাঃ) প্রদত্ত প্রথম খুতবার পর তাঁর হাতে] এক বৃহৎ দল বয়আত হয়েছিল। আর হযরত উমরের উক্ত খুতবার পর সর্বসাধারণের বয়আত মিম্বারে অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "রাত-দিনের অবসান অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আবারও লাত ও উয্যার পূজা করা হবে।" আমি বল্‌লাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরআন করীমে যখন এ আয়াত নাযেল হলো ঃ 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং সত্য দীন সহ পাঠিয়েছেন, যেন সকল দীনের ওপরে এ দীনকে বিজয় ও প্রাধান্য দান করেন যদি মুশরিকরা অপছন্দই করুক তবুও, তখন আমি মনে করতাম এ বিজয় ও প্রাধান্য হবে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, প্রাধান্য যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন ততদিন থাকবে। এরপর খোদাতাআলা মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। আর যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই মারা যাবে। কেবল তারাই অবশিষ্ট থেকে যাবে যাদের মাঝে কোনো পুণ্য থাকবে না। তারা আবার তাদের পূর্বপুরুষদের শিরকপূর্ণ ধর্মে ফিরে যাবে। আর এভাবে পুনরায় 'লাত ও উয্যার' উপাসনা শুরু হয়ে যাবে।'

আল্লামা ইবনে হাইয়ান (রহঃ) সূরা আস্ সাফ্‌ফের উক্ত আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, ইত্‌ফায়িন্ নূর অর্থাৎ জ্যোতিকে নিবিয়ে দেয়ার দ্বারা বুঝায়, যারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাবে তারা তাৎক্ষণিকভাবে একে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। 'সুদ্দি' বলেন, তারা ইসলামকে কথার জোরে খন্ডন করতে চায়। যাহ্হাক বলেন, এর দ্বারা এই বুঝায় যে, তারা ক্রমাগত গুজব ছড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে ধ্বংস করতে চায়। ইবনে আম্বার বলেন, তারা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার যুক্তি-প্রমাণকে খন্ডন করতে চায়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের শানে নযূল (প্রেক্ষিত) এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ ওহী ইলাহী (ঐশীবাণী) একবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থগিত থাকায় কা'ব বিন আশরাফ (ইহুদী নেতা) বলতে শুরু করলো, 'হে ইহুদীরা! তোমাদের জন্য সুখবর। মুহাম্মদের প্রতি যে নূর অবতীর্ণ হতো আল্লাহ্‌তাআলা তার সে নূরকে নিবিয়ে দিয়েছেন। তিনি এ নূরকে পরিপূর্ণ করতে চান না।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এতে মর্মাহত হন। তখন এ আয়াতটি নাযেল হয় এবং ওহী ইলাহীর ধারা পুনরায় জারী হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, অপরিণামদর্শী জ্ঞানান্ধরা খোদাতাআলার এ সিলসিলাহ্‌র কদর করে নি। বরং এ নূর যেন প্রজ্জ্বলিত না হয়, সে উদ্দেশ্যে তারা একে লুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা স্মরণ রাখুক, আল্লাহ্‌তাআলা একে পরিপূর্ণতা দেয়ার ওয়াদা করে রেখেছেন' (আল্ হাকাম, ১০ই মে, ১৯০২ইং, পৃঃ ৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মসীহ্ মাওউদ চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন। কেননা, 'ইত্‌মামে নূর' (অর্থাৎ আলোর পরিপূর্ণতা)-এর জন্য চৌদ্দ তারিখের রাত নির্ধারিত" (তোহ্‌ফা গোলড়াভিয়া - রূহানী) খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃঃ ১২৪)।

তাঁর রচিত এক আরবী কসীদার কিছু অংশের অনুবাদ তুলে ধরছি ঃ 'হে আমার হৃদয়! আহমদ (সঃ)-কে স্মরণ কর যিনি হেদায়াতের উৎস ও শত্রুর ধ্বংস সাধনকারী। তিনি আল্লাহ্‌র নূর, যিনি জ্ঞানরাশীকে আবার সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। আজ হীনমন্যরা তাঁর হেদায়াতকে

নিবিয়ে দিতে ও নিস্তেজ করে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিলম্বে হলেও সুপ্রকাশিত করে ছাড়বেন' (কারামাতুস্ সদেকীন - রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭০)।

আরবী কাসীদায় তিনি আরও বলেন ঃ 'অভীষ্ট সে নুরকে তুমি কি নিবাতে উদ্যত? তোমার হাত ইহকাল ও পরকালে ধ্বংস হোক। সে নূর তো উভয় জাহানে সমুজ্জ্বল হবে। এখন আমি তোমার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রভু প্রত্যেক সেই বিষয়ের মাহাত্ম্য বিধান করেন যা তুমি গোপন কর। সকল অদৃশ্য ও গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত (আল্লামূল গয়ূব) খোদা তোমাকে জানাবেন, তুমি যে সব বিষয়কে গোপন করে আসছো তা তিনি তোমার সামনে প্রকাশ করে দিবেন, তুমি যা আজ অস্বীকার করছো।'

হযরত শায়খ মোহাম্মদ ইসমাঈল মারসাভী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একদিন আসরের নামায আদায়ের পর (উপস্থিত সবার মাঝে) মসজিদ মুবারকেই বসে পড়লেন। তিনি তখন তাঁর পাগড়ীর 'শিমলা' (শেষ প্রান্ত) হাতে নিয়ে নিজ কপালে রেখে দৃশ্যত গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় নীরব বসে ছিলেন। আমি তখন তার পা টিপতে শুরু করলাম আর তাঁর উপস্থিত ভক্তরাও তাঁর দিকে মুখ করে চুপচাপ বসা ছিলেন। পাঁচ-সাত মিনিট ব্যাপী নীরবতাই বিরাজ করলো। (তারপর) তিনি হযরত (মাওলানা নূরুদ্দীন) খলীফা আওওয়াল (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মৌলবী সাহেব! আফসোস হয়, উলামা এ নাজুক সময়টিও দেখলেন না যখন ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে চারিদিক থেকে তীর নিক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে এবং ইসলামের পবিত্র স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল চেহারায় কালিমা আরোপ করে বিশ্রী থেকেও বিশ্রী আপত্তি উত্থাপনে বিকৃতাকারে মানুষের সামনে উপস্থাপন করছে। আর এসব জঘন্য আপত্তির কারণে শত শত বয়ঃবৃদ্ধ মৌলবী-মাওলানা ও সাধারণ মুসলমান ইসলামের প্রতি বিমুখ হয়ে অন্য ধর্মের দীক্ষা নিয়েছে আর নিজেরাও জঘন্য সব আপত্তি সৃষ্টি করে ইসলামের দুর্নাম ঘটাচ্ছে ...। আফসোস! এ উলামা সাম্প্রতিক কালের অবস্থাবলী নিয়েও চিন্তা করে নি।

হে গাফিল ও উদাসীন ব্যক্তিরা! তোমরা তো ইসলামের খোঁজ-খবর নিলে না। খোদাতাআলাও কি তোমাদেরই মত গাফিল ও উদাসীন ছিলেন? তিনি আলবৎ উদাসীনতার উর্ধ্বে। সেজন্য যথাসময়ে খোঁজ নিয়েছেন এবং আমাকে স্বর্গীয় পানি পান করিয়ে ইসলামের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন, যেন আমার মাধ্যমে ইসলামকে সঞ্জীবিত করেন ও সকল ধর্মের ওপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি এখন কেবল আমাকেই সাহায্য-সমর্থন করবেন, তোমাদের বাধা-বিপত্তিকে তিনি নিজে অপসারিত করবেন ও আমাকে আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে যথাযথভাবে সফল করে তুলবেন। আর আমাকে এমন সব মুখলেস ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ দান করবেন যারা আমার উদ্দেশ্য ও কাজকে জগতের প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দিবে। একথা আমি নিজে থেকে বলছি না বরং খোদাতাআলা নিজে বার বার আমাকে আশ্বাস দান করেন। আর যা আমি বলছি তা কেবল তাঁরই বলাতে আমি বলছি তাঁরই বক্তব্যকে আমি প্রতিধ্বনিত করছি। অতএব যে স্বর্গীয় পানি আমাকে পান করিয়েছেন সে একই পানি তিনি আমার আন্তরিক নিষ্ঠাবান বন্ধুদেরকেও পান করাবেন এবং আমার উদ্দেশ্যকে যারা পূর্ণ করতে যত্নবান হবে, আল্লাহ্তাআলা তাদেরও সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে সফলতার পর সফলতা দান করতে থাকবেন, কেননা তারা খোদাতাআলার ইচ্ছার পূর্ণতা সাধনকারী হবে। ... হে গাফিল-উদাসীনরা! তোমরা যত ইচ্ছা জোর চেষ্টা চালাও। আল্লাহ্তাআলাও এখন এ ইচ্ছাই করেছেন যে, আমার মাধ্যমে তিনি ইসলামকে পুনঃ জীবিত করবেন ও সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করবেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বদলে দেয় এমন কে আছে?

আমি সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে আহ্বান জানিয়েছি, 'আসুন! ইসলামের সাথে নিজ নিজ ধর্মের মোকাবেলা করুন।' কিন্তু কেউ মোকাবেলায় আসে নি। দুনিয়া দেখে নেবে ইসলামের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা আমাকে ইসলামের শত্রু আখ্যায়িত করেছ। অথচ আমি যে ইসলামের একজন সামান্য খিদমতগার (সেবক) ও আঁ হযরত (সঃ)-এর তুচ্ছ গোলাম (অনুগত দাস)। আমি সে পবিত্র (রসূল)-এর গুণাবলীকে দুনিয়ার অন্ধদের দেখিয়ে সে পবিত্রের চেহারাকে আলোকোজ্জ্বল করে দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। সে সূর্যের সামনে আমি এক কণাবৎ। তিনি (সঃ) আমার অনুসরণীয় গুরু। আমি সে পবিত্রের অনুগত শিষ্য। তাঁরই জ্যোতিঃ দিয়ে আল্লাহ্তাআলা আমাকে জোতির্ময় করেছেন। সে পবিত্র (রসূল)-এর সমকক্ষতা আমি কী করে করতে পারি! তবে আমি নবী। আমার নবুওয়ত সে মহাপবিত্র নবুওয়তকেই স্পষ্টভাবে দেখবার জন্য মাত্র। আমি তাঁর প্রতিচ্ছায়া। প্রতিচ্ছায়া তার কায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না" (রেজিষ্টার রিওয়ায়াত সাহাবা, ৭ম পৃঃ ৮৬-৮৯)।

তাঁর ফার্সী কবিতা থেকে কিছু অংশের অনুবাদ ঃ "যারা আমার আলোকমালার দিকে একে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় এর জন্য আমার কোন ভয় নেই- কী করে তারা সেই আলোকে কখনও ঢাকতে বা গোপন করতে পারে যা খোদাতাআলা আমার প্রকৃতিতে নিহিত করেছেন? তাদের হৈ চৈ তে আমার মনে কোন অস্থিরতা নেই। সত্যবাদী কখনও কাপুরুষ হয় না যদিও সে কিয়ামতের সম্মুখীন হয় তবুও।"

মার্চ ১৮৮২ইং তারিখঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সুদীর্ঘ ঐশীবাণীর সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ উপস্থাপন করছি ঃ 'আমরা তোমার প্রশংসা করি ও তোমার প্রতি দুরূদ পাঠাই। এ লোকগুলো খোদার নূরকে তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায়, কিন্তু খোদা তাঁর নূরকে পূর্ণ না করা পর্যন্ত ছাড়বেন না, যদিও অস্বীকারকারী তা অপছন্দ করে তবুও। আমরা অচিরেই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো। যখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে তখন সারা যুগ তোমার দিকে ঝুঁকবে ও তারা বলবে, এ যে সত্যবাদী ছিল" (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৬)। তাঁর প্রতি আরবী ভাষায় আরেকটি ইলহাম (অনুবাদ) ঃ "তাদেরকে বল, হে অস্বীকারকারীগণ! আমি সত্যবাদীদের একজন। কিছুকাল পরে তোমরা আমার (সত্যতার) নিদর্শনাবলী দেখতে পাবে। আমরা তাদের আশে-পাশে চারদিকে এবং স্বয়ং তাদের ভেতরে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অকাট্য যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা হবে ও বিজয় সুস্পষ্ট হবে। খোদা তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেখাবেন। তিনি কোন মিথ্যাবাদী সীমালঙ্ঘনকারীর পথপ্রদর্শক হন না। তারা আল্লাহ্র নূরকে নিবিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ একে পরিপূর্ণ করবেন যদিও অস্বীকারকারীরা অপছন্দই করুক। আমাদের ইচ্ছা, আকাশ থেকে কিছু গোপন রহস্য তোমার প্রতি অবতীর্ণ করবো ও শত্রুদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেব এবং ফেরাউন ও হামান আর তাদের বাহিনীকে সেই সকল বিষয় দেখাব যা তারা ভয় করে। ... সেই আল্লাহ্ যিনি রহমান, তিনি তাঁর খলীফা সুলতানের জন্য নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেন ঃ তাকে এক বিরাট দেশ দান করা হবে, আর প্রভূত তত্ত্ব-জ্ঞানের ভান্ডার তার হাত দিয়ে খোলা হবে এবং পৃথিবী তার প্রভু-প্রতিপালকের জ্যোতির দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠবে। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তোমাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর।"

(ইযালা আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৬)

১৮৯৩ইং সালের ইলহাম ঃ **"বাশ্‌শারানী রব্বি ওয়া কালা ইন্নি সা-উতিকা বারাকাতিন ওয়া আজলা আনওয়ারাহা হাত্তা ইয়াতাবার্‌রাকা বিসিয়াবিকাল মুলূক ওয়াস্ সালাতীন"** (অর্থ ঃ) 'আমি তোমাকে বরকত ও আশিস দান করবো এবং তাঁর আলোকমালাকে প্রজ্বলিত করবো, শেষ পর্যন্ত রাজা-বাদশাগণ তোমার বস্ত্র থেকে আশিসান্বেষণ করবে" (তোহ্‌ফা বাগদাদ, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২১)।

১৮৮২ সালের আরবী ইলহাম সমষ্টির কিছু অংশের অনুবাদ ঃ "আল্লাহ্ আরশ থেকে তোমার প্রশংসা করছেন। আমরা তোমার প্রশংসা করি ও তোমার প্রতি দুরূদ প্রেরণ করি। আল্লাহ্‌র নূরকে মানুষ তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ সে নূরকে সম্পূর্ণ না করে ছাড়বেন না যদিও অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করুক তবুও। আমরা অচিরেই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং যামানা আমাদের দিকে ঝুঁকবে তখন বলা হবে, যেভাবে তোমরা উপলব্ধি করেছ তা কি সত্য ছিল না?" (তাযকিরা পৃঃ ৪৮)।

১৯০০ইং সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ আরেকটি ইলহামের অনুবাদ ঃ এটা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ। তিনি তাঁর নেয়ামতকে তোমাতে পরিপূর্ণ করবেন যাতে তা মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয়। আল্লাহ্‌তাআলা বহু সংগ্রামে তোমার সাহায্য করবেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেন, যদিও অস্বীকারকারীরা অপছন্দ করুক তবুও। তারা ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলকারী। দেখ, আল্লাহ্‌র কৃপা তোমার নিকটে, তাঁর সাহায্যও তোমার থেকে দূরে নয়" (তাযকিরা পৃঃ ৭৫)

১৯০০ সালে অবতীর্ণ ইলহাম (ঐশী বাণী) ঃ *"ইন্নি হাশিরু কুল্লা কওমিন ইয়াতূনাকা জুনুবান ওয়া ইন্নি আনারতু মাকানাকা তানযীলুম্ মিনাল্লাহিল আযীযির রহীম* - আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে দলকে দল তোমার দিকে পাঠাব। আমি তোমার ঘরকে আলোকিত করে দিয়েছি। সেই খোদার বাণী যিনি মহা পরাক্রমশালী বার বার কৃপাকারী" (আরবাঈন, ৩য় খন্ড, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৪২৩-৪২৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় এ দোয়ার মাধ্যমে খুতবাটি সমাপ্ত করছি ঃ

"হে সর্বশক্তিমান খোদা! হে নিজ বান্দাদের পথ-প্রদর্শক! এখন এ যুগটিকে তোমার নিজের দিকে, (তোমার) কিতাবের দিকে আর তোমার তৌহীদের দিকে টেনে নাও। কুফ্‌রী ও শির্‌ক অনেক বেড়ে গেছে এবং ইসলাম হ্রাস পেয়েছে। এখন হে মহানুভব! পূর্ব পশ্চিমে এক বায়ু প্রবাহিত কর, আকাশে এক আকর্ষণের নিদর্শন প্রকাশিত কর। হে মহাকৃপাকারী! তোমার কৃপার আমরা বড়ই মুখাপেক্ষী। হে পথপ্রদর্শক! তোমার পথ-নির্দেশনাকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। বরকপূর্ণ সে দিন, যখন তোমার জ্যোতি ও নূর সুপ্রকাশিত হবে। কতো শুভ সে মুহূর্ত যখন তোমার বিজয় ডঙ্কা বেজে ওঠবে" (আইনা-এ-কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড পৃঃ ২১৩)।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পুস্তক পর্যালোচনা

## আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) প্রণীত Islam's Response to Contemporary Issues গ্রন্থের প্রকাশিত আরবী অনুবাদ সম্পর্কে দামেস্কস্থ 'দারুশ্ শাফীক পাব্লিসার্শ'-এর পর্যালোচনা

[দামেস্কের উক্ত প্রকাশনী সংস্থার পক্ষ থেকে হুযূর (আইঃ)-এর নামে আরবীতে লিখা তাদের এক পত্রে উল্লিখিত গ্রন্থটির সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করা হয়েছে এর অংশ বিশেষের অনুবাদ দেয়া হ'ল]

সর্বপ্রথম আমি আপনার প্রণীত Islam's Response to Contemporary Issues-এর আরবী অনুবাদ 'আল্ ইসলাম ওয়াত্ তাহাদ্দীয়াতুল্ মাআসিরাহ্' পুস্তক পাঠে যে আনন্দ পেয়েছি তা প্রকাশ না করে পারছি না। পুস্তকের বিষয়-বস্তু যেভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করেছেন তা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। আপনি এ উর্বর প্রণয়নের দ্বারা ইসলামী জ্ঞান-ভান্ডারে অতি উচ্চমানের সংযোজন করেছেন।

আমি এ বিষয়েও সাক্ষ্য না দিয়ে পারছি না যে, গ্রন্থটিতে কঠিন বিষয়াবলীর সম্পর্কে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কুরআন ও হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাসভিত্তিক খাঁটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরেছেন। গবেষণামূলক গ্রন্থটি একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দৃশ্যমান সব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রণীত হয়েছে। আর এ পর্যায়ে এর প্রণয়নে মূল ইসলামী উদ্ধৃতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ এবং নবী করীম (সঃ), সাহাবা-কিরাম ও পরবর্তী মুসলমানদের ইতিহাসের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ ইত্যাদি-এ সবই এমন বিষয়, যা গ্রন্থের উপজীব্য ও উপাদান সম্পূর্ণ ইসলামী ছাঁচে গড়ে ওঠার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

আমার বিশ্বাস, গ্রন্থটি এর বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত স্বার্থকভাবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে। যে গভীর নিষ্ঠা ও আবেগ-উদ্দীপনার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরা ইসলামী উত্তরাধিকারকে নিজেরা লালন করেন এর পর তা এ দীনের যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন, এ মহান গ্রন্থটি তাদের সে নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা-সাধনারই প্রতিফলন। এটাই ইসলামেরও লক্ষ্যবস্তু। আমার ধারণা এর সফল বাস্তবায়নে আহমদীয়া জামাত পূর্ণোদ্যমে সচেষ্ট। তাই আমি আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের মাঝে সত্যিকার ইসলামের এ চেহারা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষতঃ এ কারণেও যে, এখন ইসলামী সরকারগুলোও গন্তব্যের শেষ সীমায় পৌছে যাচ্ছে এবং ধর্মীয় গতানুগতিক অনুকরণবাদী (তকলীদী) ও পুরুষাণুক্রমে ঐতিহ্যগত (সালাফি) চিন্তাধারাও ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দাবীতে অক্ষম হয়ে পড়ার ঘোষণা করছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত যে দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে তা অনেক বড়। এ গ্রন্থ পাঠে এবং দামেস্কে আহ্‌মদীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও ভাব-বিনিময়ে এটাই অনুভব হয়, আহমদীগণ যে ইসলামের সহজাত পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী তা তারা তাদের জ্ঞান-গরিমা ও কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা প্রমাণ করছেন" (সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান, ২৩/৩০ অক্টোবর, ২০০২ইং হতে)

অনুবাদ- **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# মুনাজাতে রসূল (সঃ)

## [রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২৯তম কিস্তি)

### ঋণ এবং আরও অনেক দুর্বলতা দূরীভূত হওয়ার দোয়া

♦ হযরত আলী (রাঃ)-কে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঋণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এ দোয়া শিখান ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মাক ফিনা বিহালালিকা 'আন হারামিকা ওয়াগনিনা ফি ফাযলিকা 'আম্মান সিওয়াকা- তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে নিজেদের হালাল (রিয্ককে) যথেষ্ট করে দাও আর আমাদেরকে তোমরা আশিসক্রমে তুমি ছাড়া অন্য সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দাও।

♦ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ আমামাহ্ (রাঃ)-কে নামাযের সময় বিচলিত অবস্থায় মসজিদে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি ঋণ ও অন্যান্য অস্থিরতার কথা বল্লেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাবো যাতে তোমার ঋণ ও অস্থিরতা দূর হয়? পুনরায় তিনি বল্লেন, সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া করতে থাকো। আবূ আমামা (রাঃ) বলেন, আমি এ দোয়া পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার সব অস্থিরতা ও ঋণ দূর করে দিয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ ،وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ،وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ۔

(ابوداؤد کتاب الصلوۃ)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি - ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসালি-ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি- ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল গালাবাতিদ্দায়নি ওয়া কুহ্‌রির্ রিজালি - আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সালাত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় তোমার আশ্রয়ের ছায়াতলে আসছি। আর বিফলতার পথে যাওয়া থেকে এবং শিথিলতা দেখানো থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। এবং আমি কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। তদুপরি ঋণ ও লোকদের চাপে পিষ্ট হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

### ঋণ মুক্তির আরও একটি দোয়া

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) আমার নিকট আসলেন। বললেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাকে শিখিয়েছেন তুমি কি সেই দোয়াটি শুনেছো? হযরত আয়েশা দোয়াটি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তিনি (রাঃ) বল্লেন, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীদের যে দোয়া শিখিয়েছিলেন। কারও পাহাড় পরিমাণ যদি সোনাও ঋণ হয় আর সে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ এ ঋণ দূর করে দেবেন। সে দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ ،كَاشِفَ الْغَمِّ،مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ رَحِيْمَهُمَا اَنْتَ تَرْحَمُنِیْ فَارْحَمْنِیْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِیْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔ (مستدرک حاکم مطبوعہ بیروت جلد ا صفحہ ۵۱۵)

(আল্লাহুম্মা ফরিজাল হাম্মি- কাশিফাল গাম্মি- মুজীবাদা'ওয়াতিল মুযত্বর্‌রীনা রহমানা-দ্‌দুন্‌ইয়া ওয়ালআখিরাতি ওয়া রহীমাহুমা আন্‌তা তারহামুনী ফারহামনী বি রহমাতিন তুগনীনী বিহা 'আন্ রহমাতি মান সিওয়াকা - মুসতাদরাক হাকিম, বৈরুতে মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৫)।

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্! সংকট নিরসনকারী ও দুঃখ মোচনকারী! দুর্ভাগাদের দোয়া শ্রবণকারী! দুনিয়া ও আখিরাতে না চাইতেই দানকারী! পরিশ্রমের মর্যাদা দানকারী! তুমিই আমার প্রতি কৃপা করে থাকো। সুতরাং তোমরা এমন বিশেষ কৃপা থেকে আমাকে অংশ দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সব রকমের কৃপা দিয়ে অভাবমুক্ত করতে পারে না। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

## সালানা জলসার ইতিবৃত্ত

বছরে সে জলসা একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে একে সালানা জলসা বা বাৎসরিক সম্মেলন বলে। আহমদী জামাতের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কাদিয়ানে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ তারিখে। এ জলসা অনুষ্ঠানের পটভূমি এরূপ।

১৮৯১ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'আসমানী ফয়সালা' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এতে তিনি সেসব আলেমদের আহ্বান করেন যারা তাঁকে কাফির আখ্যা দিয়েছিলেন। এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো যে, কুরআন মাজীদে মু'মিনদের যে চিহ্নাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এর ভিত্তিতে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করুন। এ প্রতিযোগিতায় সিদ্ধান্ত দেয়ার যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করার জন্যে লাহোরে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেন তিনি। আর এ আঞ্জুমানের সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে। তিনি এ আঞ্জুমানের অবকাঠামো সৃষ্টির জন্যে আরও পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে জামাতের লোকদের ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৯১ তারিখে কাদিয়ানে আসার আহ্বান জানান। সুতরাং এ জলসায় অংশ গ্রহণের জন্যে ৭৫ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি উপস্থিত হন। আর সেদিন যুহরের নামাযের পরে কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে জলসা আরম্ভ হয়। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রাঃ) 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তিকাখানা পাঠ করেন। সেদিন সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেন এ পুস্তিকাখানা প্রকাশ করা হয়। আর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে জেনে নিয়ে আঞ্জুমানের সদস্যদের যেন নিযুক্ত করা হয়। এর পর জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। জামাতের বন্ধুগণ হুযূর (আইঃ)-এর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করেন। সংক্ষেপে এ ছিলো জলসার কার্যবিবরণী। পরে এটাই জলসা সালানার রূপ পরিগ্রহ করে।

**হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সময়কালীন অন্যান্য জলসা ঃ**

জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় সালানা জলসা ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯২ কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে ৫০০ বন্ধু যোগদান করেন। এতে কাদিয়ানের বাইরের ছিলেন ৩২৭ জন। ১৮৯৩ এর সালানা জলসা বিভিন্ন কারণে স্থগিত থাকে। ১৮৯৪ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৯৬ সনে লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী' প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এজন্যে এ

বছরের সালানা জলসা স্থগিত থাকে। ১৯০০ সনেও কাদিয়ানের মসজিদে আকসাতে ২৬-২৮ ডিসেম্বর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও অসুস্থতার কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এতে মাত্র একবার ভাষণ দেন। এতে ১৫০০ বন্ধু যোগদান করেন। ১৯০১ সনে বহুসংখ্যক বন্ধু এ জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সনের জলসা সালানার স্মরণযোগ্য বিষয় হলোঃ জলসায় বেহেশ্‌তি মকবেরার ব্যবস্থাপনার জন্যে একটি আঞ্জুমান গঠন করা হয়। এর নাম 'আঞ্জুমান কারপারদাযানে মাসালেহ্ বেহেশ্‌তি মাকবেরা।'

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের শেষ জলসা অনুষ্ঠিত হয় কাদিয়ানের মসজিদুল আকসাতে ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৭ সনে। ২৫ তারিখ আঞ্জুমান তশহিযুল আযহানের সভা হয়। ২৬ তারিখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সকালে যখন ভ্রমণে গেলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক বন্ধু একত্র হয়ে গেলেন। ভ্রমণের সময় হুযূর (আঃ) একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যান। আর দু'ঘন্টা ধরে তাঁর খাদেমদের মোসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। ২৭-২৮ তারিখ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা আত্ম-শুদ্ধি প্রসঙ্গে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২৮শে ডিসেম্বর তিনি (আঃ) বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ

"জীবনের কোন ভরসা নেই। আজ এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন এদের মধ্যে কে আগামী বছর পর্যন্ত জীবিত থাকবে আর কে মারা যাবে তা জানা নেই।"

এ জলসায়ও অনেক লোক অংশ গ্রহণ করেন। জুমুআর দিন মসজিদে আকসার আশ-পাশের দোকান ঘর-বাড়ী এবং ডাকঘরের ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে লোকেরা নামায আদায় করে। সালানা জলসার সূচনা থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের ১৭ বছর পর্যন্ত জলসার দিনগুলোতে তিনটি জলসা অর্থাৎ ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০২ সনের জলসা স্থগিত করা হয়। আর চৌদ্দটি জলসা এমনভাবে অনুষ্ঠিত হয় যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সশরীরে উপস্থিত থাকেন এবং বন্ধুগণ কল্যাণ লাভে ধন্য হন।

### হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর খেলাফতকালীন সালানা জলসা (১৯০৮-১৯১৪)

হযরত হাকীম মৌলভী আলহাজ্জ নূরুদ্দীন সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৬টি সালানা জলসা রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯০৯ সনের সালানা জলসা বিভিন্ন কারণে ১৯১০ সনের ২৫-২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। আর ১৯১০ সনের সালানা জলসা ২৫-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

### হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেলাফতকালীন সালানা জলসা

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর খেলাফত ১৯১৪ সনের ১৩ই মার্চ থেকে ১৯৬৫ সনের ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কাদিয়ানে ৩৩টি সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৩২টি জলসা মসজিদ নূর ও এর চারিদিকের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আর ১৯৪১ সনের জলসা মসজিদে আকসাতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সনের জলসা মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এসব জলসা সম্বন্ধে সামান্য বিবরণ ঃ

♦১৯১৪ সনে প্রথম বারের মত জলসায় মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়া হয়।

♦১৯১৭ সনে প্রথম বারের মত মহিলাদের পৃথক জলসার ব্যবস্থা করা হয়।

♦১৯২২ সনে লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথমবার লাজনার ব্যবস্থাধীনে হযরত ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রাঃ)-এর বাড়ীতে প্রথম জলসা হয়।

♦১৯৩৬ সনে জলসায় প্রথম লাউডস্পীকার ব্যবহৃত হয়।

♦১৯৩৯ সনে সালানা জলসা খেলাফত জুবিলীর জলসা হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ ডিসেম্বর সকাল বেলা খেলাফত জুবিলীর কর্মসূচী আরম্ভ হয়। বিভিন্ন এলাকা ও দেশ থেকে জামাতসমূহ আল্লাহ্‌র প্রশংসাগীতি ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কবিতার পংক্তি গাইতে গাইতে পতাকা নিয়ে জলসাগাহে পৌঁছেন। পতাকার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০টি। জলসা গাহের চারদিকে পতাকাগুলো গেড়ে দেয়া হয়েছিলো। হযরত চৌধুরী জাফর উল্লাহ্ খান সাহেব ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। হুযূর (আইঃ) এটা গ্রহণ করেন এবং তাঁর (রাঃ) বক্তৃতায় এর উল্লেখ করে এ টাকা জামাতের কাজে লাগানোর ঘোষণা দেন। এর পর হুযূর (রাঃ) দোয়া পড়তে পড়তে নারায়ে তকবীরের সাথে আহমদীয়তের পতাকা ও খোদ্দামের পতাকা উড়িয়ে দেন এবং মহিলাদের জলসা গাহে গিয়ে লাজনার পতাকা উড়ান। এবারই দু'জন ইংরেজ মহিলা জলসায় যোগদান করেন।

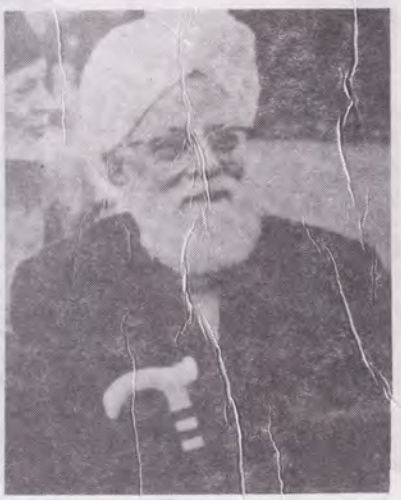

### একটি তাৎপর্যপূর্ণ জলসা

১৯৪৪ সনের জলসা বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানানো হয় যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। সুতরাং তিনি এ জলসায় যে বক্তব্য রাখেন এতে শপথপূর্বক এ বিষয় উপস্থাপন করেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ মাওউদ। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্‌তাআলা সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের যে ৫২টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা আমার মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে।

### রাবওয়ার জলসা সালানা

১৯৪৯ সনের জলসা সালানা ১৫-১৭ এপ্রিল, ১৯৪৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিলো

রাবওয়ায় প্রথম জলসা সালানা। এ জলসার কয়েকদিন পূর্বে রাবওয়ার রেলওয়ে ষ্টেশনের অনুমতি দেয়া হয়। এতে মেহমানদের খুব সুবিধা হয়। মেহমানদের থাকার জন্যে ষ্টেশনের কাছেই ব্যারাক বানানো হয়েছিলো। এগুলোর স্বল্পতার কারণে অনেক মেহমান তাবু টানিয়ে থেকেছেন। একটা পাহাড়ের পাদদেশে লংগর খানার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এতে ৪৫টি তন্নুর বানানো হয়েছিলো।

১৯৬৪ সনে মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের শেষ সালানা জলসা প্রতিপন্ন হলো। এ জলসায় হুযূর (রাঃ) অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেব (রাঃ)।

### হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ)-এর খেলাফতকালীন জলসা সালানা

৮ই নভেম্বর, ১৯৬৫ তারিখ কুদরতে সানীয়ার তৃতীয় বিকাশ হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের স্কন্ধে খেলাফতের মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁর খেলাফতকালীন সালানা জলসাগুলো রাবওয়াতেই অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সনের জলসা সালানা রমযানের কারণে ২৬-২৭ জানুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ১৯৬৭ সনের জলসাও ১১-১৩ জানুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে ১৯৬৮ সনে দু'টি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে জলসা স্থগিত রাখা হয়। ১৫শ' হিজরী সনের ১ম জলসা ২৬-২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সনের জলসা তৃতীয় খেলাফতের শেষ জলসা সাব্যস্ত হয়। এ পর্যায়ের সব পুরুষের জলসা মসজিদে আকসা রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

### হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খেলাফত কালীন সালানা জলসা

১৯৮২ সন থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খেলাফতের পর্যায় আরম্ভ হয়। তাঁর খেলাফতকালে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সনে রাবওয়াতে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পরে আইনগত কারণে রাবওয়াতে আর জলসা হতে পারে নি। ১৯৮৩ সনে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় পৌনে ৩ লক্ষ। উল্লেখ্য, ৭৫ জন নিয়ে এ জলসা আরম্ভ হয়েছিলো ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে।

১৯৬৪ সনের আগষ্ট ২৯-৩০ থেকে বৃটেনে রীতিমত সালানা জলসা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আর ১৯৮৪ সনে ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী যুগ-খলীফার সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে এটা আন্তর্জাতিক ও কেন্দ্রীয়রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৮৪ সনের ২৫-২৬ আগষ্ট প্রোগ্রাম মোতাবেক জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ১৯৮৫ সনের ৫-৭ এপ্রিল প্রথম বারের মত লন্ডনের সারে এলাকার টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৮টিরও অধিক দেশ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এ জলসায় যোগদান করেন। এথেকে লন্ডনে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা শুরু হয়। এতে হুযূর (আইঃ) ৩ দিনই ভাষণ দেন। ১৯৮৭ সনের সালানা জলসার বিশেষ দিক ছিলো এই যে, এখানে প্রথমবার বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৯৮৮ সনে ১১৭টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এতে যোগদান করেন।

১৯৮৯ সনের জলসা শত বার্ষিকী জুবিলী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জলসার বিশেষত্ব ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের এতে যোগদান। বৃটেনের জলসার বড় আকর্ষণ হলো আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান। ১৯৯৩ সনের জলসা থেকে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। আর এম, টি,এ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা এতে যোগদান করছেন।

### সালানা জলসা কাদিয়ান

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের জলসা যথারীতি অব্যাহত আছে। ১৯৪৭ সনে ২৫৩ জন দরবেশ ও ৬২ জন অমুসলিম জলসায় যোগ দেন। এরপর কয়েক বছর ছাড়া এ জলসা অব্যাহত ছিলো। ১৯৯১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ব্যক্তিগতভাবে এতে যোগদান করেন। এটা ছিলো ইতিহাসের একটি বিখ্যাত দিন। ১৯৪৭ এর পরে খলীফাতুল মসীহ্র উপস্থিতিতে এটিই প্রথম জলসা।

### বিশ্বের অন্যান্য দেশে সালানা জলসা

আল্লাহ্তাআলার ফযলে দেশে দেশে এখন সালানা জলসা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে কখন সালানা জলসা আরম্ভ হয় একটি বিবরণ দেয়া হলো ঃ

| দেশের নাম | সন | দেশের নাম | সন |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৯২৩ | আমেরিকা | ১৯৪৮ |
| মরিসাস | ১৯২৩ | সিয়েরালিওন | ১৯৪৯ |
| ঘানা | ১৯২৩ | জার্মানী | ১৯৭৬ |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৯২৭ | কানাডা | ১৯৭৭ |

### বর্তমানে যেসব দেশে জলসা হচ্ছে ঃ

অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কঙ্গোরিপাবলিক (যায়ারে), ভারত, নরওয়ে, মায়ানমার, ফ্রান্স, আইভরিকোস্ট, গুয়েতেমালা, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, তাজানিয়া, ট্রিনিদাদ, জার্মানী, ঘানা, বাংলাদেশ, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, নিচাল, বুর্কিনাফাঁসু, নাইজেরিয়া, ভুটান, গিনি বাসাও, লাইবেরিয়া সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, সুইডেন, জাম্বিয়া, ইংল্যান্ড, ইউগান্ডা, আমেরিকা, বসনিয়া, বেলজিয়াম, ফিজি, জাপান, পর্তুগাল, বেনীন, গ্যাম্বিয়া, পাকিস্তান, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, সিয়েরালিওন, সুইজারল্যান্ড, সিনেগাল, সুরিনাম, জিম্বাবুয়ে, মরিসাস আরও অন্যান্য দেশে।

### ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বয়াতের তালিকা ঃ

| সন | সংখ্যা | সন | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১৯৯৩ | ২,০৪,৩০৮ | ১৯৯৮ | ৫০,০০,৫৯১ |
| ১৯৯৪ | ৪,২১,৭৫৩ | ১৯৯৭ | ১,০৮,২০,২২৬ |
| ১৯৯৫ | ৮,৪৭,৭২৫ | ২০০০ | ৪,১৩,০৮,৯৭৫ |
| ১৯৯৬ | ১৬,০২,৭২১ | ২০০১ | ৮,১০,০৬,৭২১ |
| ১৯৯৭ | ৩০,০৪,৫৮৫ | ২০০২ | ২,০৬,৫৪,০০০ |

(সূত্র ঃ মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব কর্তৃক প্রণীত 'জলসা সালানা' পুস্তক)

সংকলন ঃ **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

# কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী' হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক ৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ইং তারিখের ঈদুল আযহিয়ার খুতবার বঙ্গানুবাদ]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাঃ) বলেন ঃ

**সামান্য সামান্য অজুহাতে কুরবানী হতে বঞ্চিত থাকিও না**

অনেক লোক এরূপ আছে যারা সামান্য সামান্য কারণে কুরবানী হতে বিরত থাকেন। ধর্মের সব দিক তারা লক্ষ্য করেন না এবং মৃত্যু তাদের চোখের সামনে থাকে না। এ কারণে সামান্য সামান্য বাধা তাদের নিকট পাহাড়স্বরূপ বোধ হয়। অথচ এরূপ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের প্রতিবেশীগণ কুরবানী করতে ত্রুটি করেন না, বরং অধিকতর কুরবানী করে অধিকতর সোয়াবের অধিকারী হন। আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন, 'আমি মু'মিনগণকে অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষী করেছি'। এর অর্থ আমি এই করি, কেয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ বাধা-বিঘ্ন পেশ করে বলবে,- "আমাদের সামনে এই এই অসুবিধা ছিল তাই আমরা কুরবানী করতে পারি নি- তখন আল্লাহ্তালা মুমিনগণকে তাদের সামনে পেশ করে বলবেন- "এরা তোমাদের মতই মানুষ ছিল, এদেরও অভাব-অসুবিধা ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এরা ক্রমাগত কুরবানী করেই গিয়েছে; অতএব তোমাদের ওজর-আপত্তি বিশ্বাসযোগ্য নয়"।

আল্লাহ্তাআলা বলেন, 'আমি মুহাম্মদকে (সঃ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করেছি"। 'মুসলমানদের দুর্বল ও ভীরু লোকগণ যখন নিজ নিজ ওজর-আপত্তি পেশ করবে তখন আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে বলবেন,-"তোমরা পার্থিব সম্বলের দিক দিয়ে মুহাম্মদ (সঃ) হতে অধিক দুরবস্থায় ছিলে না। তিনি যদি এরূপ নিঃসম্বল হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করতে পারলেন তবে তোমরা পারলে না কেন?" তদ্রূপ অন্যান্য জাতির ওজুহাতের উত্তরে আল্লাহ্তাআলা বলবেন, মুসলমানগণ তোমাদের ন্যায়ই মানুষ ছিল, তাদের পথেও তোমাদের ন্যায়ই বাধা-বিপত্তি ছিল; তৎসত্ত্বেও যখন তারা কুরবানী করল তোমরা করতে পারলে না কেন?

প্রত্যেক জামাতেই কিছু লোক নমুনাস্বরূপ হয়ে থাকেন। তারা বিপদ-আপদ ও বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে যান। তাদেরকে

আল্লাহ্তাআলা সাক্ষীস্বরূপ পেশ করে বলেন- এরা তোমাদের মতই মানুষ। এরাই যখন অভাব-অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তোমাদের ন্যায় অবস্থার ভিতর দিয়েই কুরবানী করে গিয়েছে। তোমরা পারলে না কেন?

বাজারের এক দোকান্দার নামাযের সময় হলে উঠে চলে যায়; অপর দোকানদার বসেই থাকে এবং জিজ্ঞাসা করলে বলে, "দোকান খালি, বিক্রির সময়, কেমন করে যাবে"। তখন অপর ব্যক্তির নমুনা তার সম্মুখে পেশ করে বলা যেতে পারে, "সেই ব্যক্তিরও দোকান খালি ছিল এবং তার জন্যও বিক্রির সময় ছিল এবং তৎসত্ত্বেও সে চলে গেল। অতএব তুমিও যেতে পারতে।" কেউ কেউ বলে থাকে, "সময় টের পাই নি।"এরূপ লোকদেরকে বলা যেতে পারে। অপর লোকদের কর্মও তোমার কর্মের ন্যায়ই ছিল। তারা যখন আযান শুনতে পেল, তখন তোমারও নিশ্চয় শুনবার কথা।"ফলত যে ওজরই মানুষ পেশ করুক না কেন, এর খন্ডনকারী তার প্রতিবেশীগণের মাঝেই পাওয়া যায় এবং তারাই কেয়ামতের দিন তার সম্বন্ধে সাক্ষী হবে।

এক ব্যক্তি বলবে, "আমার সন্তানাদি অধিক ছিল বলে, আমি কুরবানী করতে পারি না"। তখন আল্লাহ্তাআলা তার চেয়ে অধিক সন্তানের পিতা এমন এক ব্যক্তিকে পেশ করে বলবেন, "এ ব্যক্তি তোমাপেক্ষা অধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করেছে, তুমি পারলে না কেন?"

অপর এক ব্যক্তি বলবে, "আর্থিক অনটন অত্যন্ত ছিল এ জন্যে কুরবানী করতে পারি নি"। তখন আল্লাহ্তাআলা অপর এক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে পেশ করে বলবেন, এর অর্থাভাব তোমার চেয়েও অধিক ছিল। সে যখন কুরবানী করল, তখন তুমি না পারার কারণ নেই।"

**ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়**

সার কথা এই, যদি মানুষ কুরবানী করতে ইচ্ছা করে তবে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন জয় করতে পারে। রসূল করীম (সঃ) একদা চাঁদার আহ্বান করেন। জনৈক সাহাবীর কিছুই ছিল না, কিন্তু আগ্রহ ছিল। তিনি তখন এক ব্যক্তির নিকট বললেন, "আমাকে সারাদিন খাটিয়ে যা ইচ্ছা মুজুরি দিন"। দু' মুঠি যব মজুরি নির্ধারিত হ'ল। তিনি সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যা সময় যে দু' মুঠি যব পেলেন তা-ই এনে আঁ হযরতের (সঃ) হস্তে সম্পূর্ণ করলেন।

কেয়ামতের দিন যখন মুনাফিকরা এ উপলক্ষ্যে কুরবানী পেশ না করার ওজর পেশ করতঃ নিজ নিজ অসুবিধা বর্ণনা করবে তখন আল্লাহ্তাআলা তাদের সকলের উত্তরে এ 'দু'মুঠি যব' উপস্থিতকারী ব্যক্তিকে পেশ করবেন, এবং তাদের আর কোন ওজর টিকবে না। আল্লাহ্তাআলা বলবেন, "তোমাদের হাতে টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী কর নি. কিন্তু এ ব্যক্তির নিকট কিছু না থাকা সত্ত্বেও সে পিছে পড়ে নি।"

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই 'ওজর' পেশ করার সময় চিন্তা করা উচিত, তার অবস্থায়ই অপর লোকগণ কুরবানী পেশ করছে। অতএব তার 'ওজর' আল্লাহ্তাআলার সমীপে কীরূপে গ্রহণীয় হবে।

**জলসা সালানার জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান**

আমি দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেক বছরই সালানা জলসার চাঁদা কম আসছে অথচ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। জলসা সালানা একটি অতি জরুরী বিষয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য খুব জোর দিয়াছেন, অতএব আমি বন্ধুগণকে পুনরায় উপদেশ দিচ্ছি যেন তারা এ উপলক্ষ্যে অধিক হতে অধিকতর কুরবানী করেন।

অবশ্য এ বৎসর আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের বহু অসুবিধা আছে; কিন্তু মু'মিনের জন্য এটা কোন চিন্তার কারণ নয়। যাদের ঈমান দুর্বল তাদের জন্য সম্পদের দিনও বিপদের দিনই হয়। যার অন্তর রুগ্ন তার নিকট কোটি টাকা হলেও সে এটাই বলবে "খাওয়ার মিলে না, চাঁদা কোথা হতে দেব"। পক্ষান্তরে মু'মিনের নিকট কিছু না থাকলেও সে বলবে, "বিসমিল্লাহ্, আমি প্রস্তুত আছি।"

### এখন প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষার সময়

এখন প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষার সময়। এক দিক দিয়ে চৌধুরী স্যার জাফরউল্লাহ্ খাঁ সাহেবের জুবিলী ফান্ডের তাহরীক, অপর দিক দিয়ে তাহরীকে-জাদীদের চাঁদার তাহরীক, আবার সাধারণ চাঁদের তাকীদও রীতিমতই আছে। এতদ্ব্যতীত এখানকার কর্মীদের বেতন কমিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাইরের জামাতসমূহকে চাঁদা বাড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে।

অতএব এখন সাধারণ আর্থিক কুরবানীর সময়। কিন্তু এরূপ সময়েই মু'মিনের ঈমান এবং ইখলাসের পরীক্ষা হয়। এরূপ সময়েই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।

### প্রকৃত বন্ধুর দৃষ্টান্ত

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) শুনাতেন, এক ধনী ব্যক্তির এক যুবক ছেলে সারাদিন বন্ধুগণের সঙ্গে বসে সময় নষ্ট করত। পিতা তাকে উপদেশ দিতেন, "এদের সঙ্গে বসে সময় নষ্ট করো না, এরা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, বরং পানাহারের ইয়ার"। কিন্তু ছেলে বলত, "আব্বা জি, আপনি অবগত নন, আপনি এদের কথা-বার্তা কখনো শুনেন নি। এরা আমার বড় বিশ্বস্ত বন্ধু"। পিতা বলতেন, "কথা বলা তো অতি সহজ"। অবশেষে পিতা একদিন পুত্রকে বললেন- "আচ্ছা আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখছি।"

পিতার এক বন্ধু ছিল। তিনি একজন সিপাহী ছিলেন। তিনি পিতার প্রথম যমানার বন্ধু ছিলেন। পিতা প্রথমতঃ সাধারণ অবস্থার লোক ছিলেন এবং পরে উন্নতি করে ধনী হন। কিন্তু সেই সিপাহীর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব পূর্বের ন্যায়ই কায়েম থাকে। কিন্তু ছেলে তাঁকে হেয় মনে করত এবং মনে বলত, "আমার পিতা এমন অনুন্নত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, অথচ আমার বন্ধুগণকে ভাল মনে করেন না যারা ভাল মানুষ এবং সম্ভ্রান্ত লোক"।

সেই বন্ধুর কথাই উল্লেখ করে পিতা একদিন তাকে বললেন, "চল, দেখা যাক, কার বন্ধু খাঁটি"। অতঃপর তিনি ছেলেকে বললেন, "তোমার বন্ধুগণই পরীক্ষা করার জন্য আমি তোমাকে ঘর হতে বের করে দিচ্ছি। তুমি তোমার বন্ধুগণের নিকট সাহায্য চাও।"

ছেলে তখন তার বন্ধুগণের বাড়ী বাড়ী যেয়ে ঘুরতে লাগল। তার পিতৃগৃহ হতে বহিষ্কৃত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়ে গেল। তার কতিপয় বন্ধু তা শুনতে পেয়ে ঘরের দ্বারে এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করাও উচিত মনে করল না। কেউ বলে দিল- 'অসুস্থ আছি"। কেউ বলে পাঠাল- "ঘরে নেই"। যারা তার এ খবর জানত না তারা এসে সাক্ষাৎ তো করল বটে, কিন্তু যখনই জানতে পারল যে, পিতা কর্তৃক গৃহ হতে বহিষ্কৃত হয়ে সাহায্য চেয়ে এসেছে, তখনই কেউ বলে দিল-আফসোস! এখন আমার টাকা অমুক জায়গায় লাগান আছে, নতুবা আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতাম; কেউ বা অন্য কোন বাহানা পেশ করল; কেউ তো এতটুকু বলে দিল, "তোমার পিতাই যখন তোমাকে বিশ্বাস করে না, আমরা কেমন করে তোমাকে বিশ্বাস করব"? এরূপ সকলের নিকট হতে নিরাশ হয়ে পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলল, "বাস্তবিকই কথা সত্য, আমার সব বন্ধুই মতলবের বন্ধু"।

তখন পিতা বলল- "চল, এখন আমি তোমাকে আমার বন্ধুকে পরীক্ষা করে দেখাই।" এ বলে তিনি পুত্রকে সঙ্গে করে রাত্র প্রায় ১২ ঘটিকার সময় স্বীয় বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন এবং দরজায় ঘা দিয়ে বললেন, "শীঘ্র বাইরে আসুন"। সেই বন্ধু প্রথমে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। তৎপর আওয়াজ শুনে চিনতে পেরে বলেন, "আচ্ছা আসছি" পিতাপুত্র দশ পনর মিনিট বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। পুত্র তখন বলল- "বুঝতে পারলাম, আপনার বন্ধুও তদ্রূপই"। পিতা বললেন, "আরে একটু অপেক্ষা কর"।

অবশেষে পনর বিশ মিনিট দরওয়াজা উন্মুক্ত হ'ল এবং সেই বন্ধু এক হাতে তরবারী, অপর হাতে একটি টাকার থলে এবং সঙ্গে বিবিকে নিয়ে বের হলেন। বিলম্বে বের হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "সারা জীবনে এ প্রথমে আপনি এ সময়ে এসেছেন। অতএব আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোন বিপদ হবে, এবং দুনিয়াতে তিন প্রকারের বিপদই হয়ে থাকে। হয়ত পরিবারস্থ কারও অসুখ হতে পারে কিংবা টাকা-পয়সার অনটন হতে পারে, কিংবা সম্মানের আশঙ্কা হতে পারে। মান-সম্মানের আশঙ্কা হতে পারে মনে করে আমি তরবারী নিয়ে এসেছি। হয়ত তদ্বারা সাহায্য হতে পারে। অসুখের সম্ভাবনা মনে করে নিজ বিবিকে দিয়ে এসেছে, কারণ স্ত্রীলোক সেবা-শুশ্রূষার কাজ উত্তম করতে পারে এবং আর্থিক অসুবিধা হতে পারে মনে করে আমি আমার সারা জীবনের সঞ্চিত ধন যা মাটির নীচে গেড়ে রেখেছিলাম তা নিয়ে এসেছে। এ কারণেই বিলম্ব হয়েছে। এখন আমি হাজির হয়েছে। যদি আপনার সম্মানের আশঙ্কা হয়ে থাকে তবে আমার তরবারী এবং প্রাণ প্রস্তুত, ঘরে যদি অসুখ হয়ে থাকে তবে আমার বিবি প্রস্তুত, আর যদি টাকা-পয়সার অভাব হয়ে থাকে তবে আমার সারা জীবনের এ সঞ্চিত ধন প্রস্তুত।"

এ কথা শুনে ছেলে বলল- "আমি বুঝতে পারলাম প্রকৃত বন্ধু কে? প্রকৃত বন্ধু লাভ করা বাস্তবিকই বড় কঠিন।" অতএব পিতা বন্ধুকে সব বিষয়ে ব্যক্ত করে বললেন, তার ছেলে বিপদগামী হয়ে যেতে চলেছিল, তাই তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এ অসময়ে তাকে কষ্ট দিতে এসেছেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

বস্তুত প্রকৃত আন্তরিকতা বিপদের সময়ে প্রকাশ পায় এবং তিনি বন্ধুর সাহায্যের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হন।

### রসূল করীম (সঃ)-এর এক সাহাবীর কুরবানীর দৃষ্টান্ত

জনৈক আনসারী সাহাবী (রাঃ) বদরের যুদ্ধে যোগদান করার সুযোগ পান নি। তজ্জন্য তিনি বড়ই ব্যথিত হয়েছিলেন। যাহোক আল্লাহ্তাআলা তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য উহুদের যুদ্ধের সুযোগ উপস্থিত করেন। তিনি সে যুদ্ধে যোগদান করতঃ যথাসম্ভব কুরবানী করেন। অতঃপর যুদ্ধে জয়লাভ হলে এবং শত্রু পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে একটু দূরে সরে কিছু খেজুর খেতে থাকেন, কারণ তিনি না খেয়ে এসেছেন। ইত্যবসরে শত্রুগণ পিছন হতে পুনরায় আক্রমণ করে। মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন মনে করে এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব তারা এ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেন না। আঁ হযরত (সঃ) আহত হয়ে এক গর্তে পড়ে গেলেন এবং সাহাবীগণ ভাবলেন, আঁ হযরত (সঃ) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তখন এ সাহাবী যিনি এ বিষয় অবগত ছিলেন না খেজুর খেতে খেতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটবর্তী হয়ে দেখলেন, মহানবী হযরত উমর (রাঃ) এক প্রস্তরের উপর বসে শিশুর ন্যায় কাঁদছেন। কারণ

জিজ্ঞেস করলে হযরত উমর (রাঃ) সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তখন সেই সাহাবীর (রাঃ) একটি মাত্র খেজুর বাকী ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তা দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, "স্বর্গ এবং আমার মধ্যবর্তী এটা ভিন্ন আর কী আছে"। অতঃপর হযরত উমরকে সম্বোধন করে বললেন উমর (রাঃ) যদি সত্য সত্যই রসূল করীম (সঃ) শহীদ হয়ে থাকেন তবে তুমি এখানে বসে আছে কেন? খোদা রসূল যথায় গিয়েছেন আমরাও তথায়ই যাব।"

তিনি এ বলে তরবারী নিষ্কোষিত করে শত্রু সৈন্যদলের প্রতি ধাবিত হলেন এবং যেয়ে যুদ্ধারম্ভ করলেন আর বহু কাফির নিহত করে এ খোদার বীর শহীদ হলেন, (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)।

যুদ্ধে পুনরায় জয় লাভ হলে পর হযরত রসূল করীম (সঃ) সাহাবাদেরকে তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কে কে 'শহীদ' বা 'যখম' হয়েছেন তা অনুসন্ধান করতঃ আহতগণকে সাহায্য এবং শহীদগণকে সমাহিত করার জন্য আদেশ করলে সাহাবীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লেন এবং আহতগণের সেবা-শুশ্রুষা এবং শহীদগণের মৃতদেহ জমা করতে লাগলেন। তখন একটি মৃতদেহ দেখে তারা চিনতে পারলেন না। এর টুকরোগুলো এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং চেহারা আঘাতের কারণে বিকৃত হয়েছিল। যাহোক তাঁর ভগ্নী তাঁর একটি অঙ্গুলি দর্শনে তাকে চিনলেন। তিনি সেই শহীদ বীরই ছিলেন। সাহাবাগণ গুণে দেখলেন, তার শরীরের এক একটি টুকরা পৃথক পৃথক পড়ে আছে।

এরূপ লোক দ্বারাই জয়লাভ হয়ে থাকে। যাঁদের হৃদয় সর্বদা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং যাঁরা বিপদের সময় অধিকতর কুরবানী করেন তাদের প্রচেষ্টায়ই বিজয় লাভ হয়। তাদের কারণেই আল্লাহ্‌তাআলার 'বরকত' নাযেল হয়।

## আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক মানুষের প্রেমের প্রতিদান

মানুষ আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে আল্লাহ্‌তাআলাও তাঁর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করেন। মানুষের প্রাণ যতই আল্লাহ্‌তাআলার প্রেমে বিগলিত হয় ততই আল্লাহ্‌ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল হন। দুনিয়ার লোক তাঁকে গালি দেয়, তাকে অপমানিত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা তাকে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও উন্নতি দান করেন। এরূপ লোকের জামাতই উন্নতি করে থাকে। অতএব আপন হৃদয় আল্লাহ্‌তাআলার এবং তাঁর সিলসিলাহ্‌র প্রেমে বিগলিত কর আর দেখ আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদিগকে কেমন উন্নতি দেন।

যাঁরা আল্লাহ্‌তাআলার হয়ে যান তাঁদিগকে কখনো কিছু চাইতেও হয় না। অনেক সময় তাঁরা অভিমানস্বরূপ বলেন, আমরা চাইব না এবং আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং তাদের যাবতীয় প্রয়োজনাদি পুরো করে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হতেই আমি শুনেছি যে, জনৈক 'বুযূর্গ' একবার অত্যন্ত বিপদে পড়েন। তখন একজন বলল, 'আপনি দোয়া করুন না কেন'। তিনি তদুত্তরে বলেন, "আমার প্রভু যদি আমাকে দিতে ইচ্ছা না করেন তবে আমার দোয়া করা বে-আদবী হবে। আর যদি তিনি দিতে ইচ্ছা করে থাকেন আমার চাওয়া অধৈর্যের পরিচায়ক হবে। এর এ অর্থ নয় যে, তিনি দোয়া করতেনই না। আসল কথা এই যে, 'কামেল' (পূর্ণ) মু'মিনগণের কখন কখন এরূপ অবস্থা হয় যে, তাঁরা বলে থাকেন, 'আমরা চাইব না, আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং আমাদের অভাব পূরণ করে দিবেন।"

কিন্তু এ অবস্থা এমনি লাভ হয় না। এটা মনে করোও না যে, তোমরা এমনি বসে থাকবে আর তোমাদের হৃদয়ে প্রেম জন্মাবে না, নামাযে চিত্ত বিগলিত করবে না, 'সদকা-খয়রাত' ও চাঁদা-প্রদানে শৈথিল্য করবে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা লাভ করবে এবং তৎসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ 'ফযল' বা অনুগ্রহের অধিকারী হবে। এরূপ কখনো হতে পারে না।

খোদাতাআলাকে লাভ করতে হলে কেবল বাহ্যিক নামায-রোযাই যথেষ্ট নয়, প্রেমিকসুলভ হৃদয় আবশ্যক। আর এরূপ প্রাণের আবশ্যক যাহা সমস্ত ওজর-বাহানা ছিন্ন করে খোদাতাআলার দিকে অগ্রসর হয়। ... প্রেমই মানুষকে প্রকৃত কুরবানী করার ক্ষমতা দেয় এবং প্রকৃত কুরবানীই মানুষকে আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয় করে। এ প্রেম বলে অনেক সময় মূর্খ লোকও খোদাতাআলাকে পেয়ে ফেলে।

অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদের (আঃ) জনৈক নিষ্ঠাবান সাহাবী মুন্সী আরোড়ে খান সাহেবের দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন ঃ

"হৃদয়ে খাঁটি প্রেম জন্মিলে খোদাতাআলা স্বয়ং সেই প্রেমিককে রক্ষা করেন। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হতে শুনেছি, সম্ভবত খলীফা হারুন-অর-রশীদের সময় মূসা-রাজা নামক জনৈক 'আহলে-বয়াত' বুযূর্গকে তাঁর কারণে 'ফেৎনা' সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার অজুহাতে বন্দী করা হয়। একদা দ্বিপ্রহর রাত্রে এক ব্যক্তি মুক্তির আদেশ নিয়ে কয়েদখানায় তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন যে, তিনি তো রাজ বন্দী ছিলেন, হঠাৎ এরূপ মুক্তির আদেশ কীরূপে হল? তিনি বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বাদশাহ্ উত্তর করলেন, "আমি নিদ্রা মগ্ন ছিলাম, এমন সময় স্বপ্নে এক ব্যক্তি এসে আমাকে জাগ্রত করেন। আমি তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। আমি তাঁর অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'হারুন-আর রশীদ, এটা কেমন কথা যে, তুমি আরামে শয়ন করছো এবং আমার পুত্র কয়েদখানায় আছে'? এ কথা শুনে আমার হৃদয়ে এরূপ ভীতি সঞ্চার হলে যে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার মুক্তির আদেশ প্রেরণ করলাম।" বুযূর্গ সাহেব বললেন, "অদ্য আমারও কয়েদখানায় অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল। ইতিপূর্বে কখনো আমার মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা হয় নি।"

বস্তুত এরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বর্ণনা আমরা কেমন করে অস্বীকার করব? এরূপ ঘটনা সত্ত্বেও আমরা কেমন করে খোদাতাআলার শক্তি ও মহিমায় সন্দীহান হতে পারি? নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিশালী ও মহিমান্বিত? কিন্তু আমাদের উচিত আমরা যেন তার শক্তি ও মহিমায় উদ্বেলিত করার এবং তার করুণা আকর্ষণ করবার যোগ্য হই।

অতএব আমি বন্ধুগণকে পুনরায় উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনারা এ মহা সময়ের মূল্য বুঝুন। বিপদ-আপদ যত অধিক হবে ততই খোদাতাআলার নৈকট্য লাভের পথ নিকটবর্তী হবে। আপনারা নিজ নিজ কোমর শক্ত করে বাঁধুন। এখন দুনিয়ার চক্ষু আমাদের প্রতি নিপতিত। তারা দেখছে, খোদাতাআলার সিপাহীগণ কেমন কুরবানী করে। সুতরাং খোদাতাআলার সিপাহীর ন্যায় নমুনাও প্রদর্শন করুন এবং প্রতিপন্ন করুন যে, দুনিয়ার সিপাহী হতে আপনাদের হৃদয়ে নিজ প্রভুর জন্য কুরবানীর স্পৃহা অধিক। যদি আপনারা একথা প্রমাণ করে দিতে না পারেন যে, আপনাদের হৃদয়ে কুরবানীর এক অফুরন্ত স্পৃহা বিদ্যমান রয়েছে, তবে আপনারা খোদাতাআলার অমর্যাদাকারী বলে প্রতিপন্ন হবেন। কারণ জগৎ তখন বলবে, তাদের হৃদয়ে খোদাতাআলার জন্য ততটুকু মর্যাদাবোধও নেই যতটুকু জাপান, জার্মান ও ইটালীর সিপাহীগণের হৃদয়ে তাদের নিজ নিজ দেশের জন্য রয়েছে। (পুনঃ প্রকাশ)

# পবিত্র কুরবানী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ্ প্রতি বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে কুরবাণীর অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ

•• "এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করেছি যাতে তারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর ওপরে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে" (সূরা হাজ্জঃ ৩৫)।

•• "আমরা তোমাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী কর" (সূরা কাওসার)।

•• "উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত আল্লাহ্র নিকট পৌছে না। বরং তাঁর নিকট তোমাদের তরফ থেকে তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) পৌছে" (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)।

আল্ হাদীস পাঠে আমরা জানতে পারি, মহানবী (সঃ) বলেছেন,

•• "হে লোক সকল। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছর কুরবানী করা আবশ্যক" (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)।

•• "যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করে নি সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে" (ইবনে মাজাহ্)।

### কতিপয় জরুরী মসলা-মাসায়েল

•• সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কিদাহ্ (ফিকাহ্ আহমদীয়া)।

•• "ঈদুল আযহার নামাযের পূর্বে পশু জবাই করলে তাতে কুরবানী হয় না"।

১০ই যিলহাজ্জ ঈদের নামাযের পর থেকে ১২ই যিলহাজ্জ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যায়" (বুখারী, মুয়াত্তা)।

•• "হযরত নবী করীম (সঃ) কুরবানী না করা পর্যন্ত রোযা রাখতেন এবং কুরবানীর গোশ্ত দ্বারা রোযা খুলতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)।

•• এতে এ প্রজ্ঞা নিহিত যে, কুরবানী দাতা ইঙ্গিতে এ কথা স্বীকার করেন, যেভাবে পশু ছুড়ি দ্বারা জবাই হচ্ছে এভাবে সে-ও প্রয়োজনে আল্লাহ্র পথে নিজের প্রাণকে কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবে।

•• হুযূর (সঃ) (সাধারণ তকবীর বাদে) প্রথম রাকায়াতে ৭ তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআয়াতে ৫ তকবীর দ্বারা দু' ঈদের নামায আদায় করতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

•• যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে 'আইয়ামে তশরীক'বা গোশ্ত, শুকানোর দিন বলে। এ দিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম। ৯ই যিলহাজ্জ তারিখ ফযরের নামায থেকে ১২ই তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত প্রতি ফরয নামাযের পর তকবীর-**আল্লাহ্ আকবর, আল্লাহ্ আকবর লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহ্ আকবর আল্লাহ্ আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ-** (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্ত প্রশংসা তাঁরই-পাঠ করতেন।

•• আঁ হযরত (সঃ) যখন ঈদের নামাযে উপস্থিত হতেন তখন এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরতেন। পথে তিনি উপরোক্ত তকবীর বেশি বেশি পাঠ করতেন।

•• আঁ হযরত (সঃ) কুরবানীর পশুকে কা'বামুখী করে শুইয়ে **'বিস্মিল্লাহি আল্লাহ্ আকবর'** বলে জবাই করতেন (মুয়াত্তা)।

•• ভেড়া, গরু, মইষ, ছাগল, দুম্বা, উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশু কুরবানী করা যেতে পারে। দু'বছরের কম বয়সের গরু, ১ বছরের কম বয়সের ছাগল ও ৬ মাসের কম বয়সের ভেড়াকে কুরবানী করা জায়েয নয় (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)।

•• গরু, মইষ ও উট ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়, আর ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায় (মুসলিম, আবূ দাউদ)।

•• যারা কুরবানী করার নিয়্যত করেন তাদের জন্যে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন অর্থাৎ কুরবানী দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত চুল, দাঁড়ি, গোফ, নখ প্রভৃতি কাটা উচিত নয় (মুসলিম)।

•• কুরবানীর পশু স্বাস্থ্যবান, নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। লেংড়া, কানকাটা, শিং ভাঁঙ্গা ও চোখ কানা পশু কুরবানী জায়েয নয় (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ নাসাঈ)।

•• একই পশু দ্বারা কুরবানী ও আকীকাহ্ দেয়া জায়েয নয়।

•• গর্ভবতী পশু কুরবানী দেয়া জায়েয নয়।

•• খুব ধারাল অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উচিত, ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা জবাই করে পশুকে কষ্ট দেয়া জায়েয নহে।

•• কুরবানীর গোশত্ আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনদেরকে দিয়ে খেতে হয়।

•• যারা নিজের নামে কুরবানী দিচ্ছেন তারাই কেবল মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী দিতে পারেন।

•• যে কুরবানীর মধ্যে লোক দেখানো ভাব বর্তমান থাকে তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হয় না।

•• কুরবানীর চামড়া একটি জাতীয় সম্পদ। সুতরাং চামড়া যাতে নিখুঁত থাকে সেজন্যে চামড়া খালনের সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তা কেটে বা ছিঁড়ে না যায়।

•• কুরবানীর চামড়ার বিক্রিত মূল্য স্থানীয় জামাতের ফান্ডে জমা করাতে হবে। এটা জামাতের প্রাপ্য (নেযামে বায়তুল মাল)।

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

পুস্তক পর্যালোচনা

# 'তবলীগে হক' বা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর 'আহ্বান'

## [আহমদীয়া মুসলিম জামাত বগুড়া এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে পঠিত]

হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর 'তবলীগে হক' শীর্ষক একটি বক্তৃতা কাদিয়ান হতে প্রকাশিত আল্ হাকাম পত্রিকায় ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ সালে ছাপা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব ইহা বাংলায় অনুবাদ করে 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। অত্র লেখাটি উক্ত পুস্তকেরই সার-সংক্ষেপ।

হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রকৃত সুন্নত বা প্রধান কাজ ছিল ইসলাম তথা তৌহীদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর হতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি এ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। তারপর তাঁর সাহাবা-এ-কেরাম ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণও হুযূর পাক (সঃ)-এর এ নীতি অনুসরণ করে যান। এর ফলে হুযূর (সঃ)-এর মৃত্যুর কয়েকটি যুগের ভিতর তৎকালীন সমগ্র বিশ্বে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। এরপর ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের ভিতর প্রচার বিমুখতা দেখা দেয়। যে কারণে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ইসলামের আগমন হলেও অন্যান্য জাতির ভিতর ইসলামের প্রসার রুদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াদা, "তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করে দেন। মুশরিকগণ যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন" (৬১ঃ১০) ব্যর্থ হতে পারে না। এ জন্যই ইসলামের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এর প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ পাক হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খিলাফতে আলা মিনহাজে নবুওয়ত প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচারের বুনিয়াদ স্থাপন করে গিয়েছেন।

'তবলীগে হক' এর অর্থ সত্যের পূর্ণ প্রচার। পুস্তকটি তাঁর দাবীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন ও প্রচারমূলক একটি বক্তৃতা যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তৎকালীন জামানার অবস্থা পর্যালোচনা করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ করেন, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগেই হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সঠিক সময় এবং এটাই যে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উপযুক্ত কাল, বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীত কোন কথা শুনলেই মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করে বসে। এ কারণে প্রত্যেক নবীকেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাই এ পুস্তকের প্রারম্ভেই বলেছেন, কারও দাবীর সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ করে শুনা মাত্র তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। কেউ কোন দাবী উত্থাপন করলে তাঁর দাবীর বিষয়-বস্তুর সবদিক গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। তিনি উল্লেখ করেন, তিনি যা বলতে যাচ্ছেন তা যদি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। যে একে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-কেই অগ্রাহ্য করে। কেননা, ধর্মের সংস্কার ও সজীবতা সাধনের জন্য প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আগমনের কথা হুযূর পাক (সঃ)-এরই কথা এবং আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পাক কালাম কুরআন তথা ধর্মের হেফাযতের দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন (১৫ঃ১০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, কুরআনের এ হিফাযত আল্লাহ্ পাক মুজাদ্দিদগণের মাধ্যমেই করে থাকেন। (কুরআন পাকও এর সমর্থন করে। দেখুন ৫ঃ৪৫ তিনি এ-ও জানান, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে যিনি মুজাদ্দিদ হিসাবে আগমন করবেন তাঁকে হাদীস শরীফে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী উপাধি প্রদান করা হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি ইবনে মাজাহ্-এর নিম্নের হাদীসটি পেশ করেন, "ওয়া লাল মাহ্‌দী ইল্লা ঈসা ইবনে মারইয়াম। অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়াম ব্যতীত কোন মাহ্‌দী নেই।" তিনি জানান, হাদীসের বর্ণনানুযায়ী শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসার কথা থাকলেও বর্তমান শতাব্দীর ১৯ বৎসর (তৎকালীন সময়) চলছে, অথচ কোন মুজাদ্দিদ নেই, যদিও জামানার মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রমাণ করে যে, তাদের সংশোধনের জন্য একজন মুজাদ্দিদ আসা অত্যাবশ্যক।

এরপর তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের ভিতরের ও বাইরের চিত্র তুলে ধরে সে সময়ই (অর্থাৎ হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ) যে যুগ-ইমামের আগমনের সময় তা প্রমাণ করেন। মুসলমানদের ভিতরের অবস্থার বর্ণনা দিতে যেয়ে তিনি বলেন, সমাজে আজ তৌহীদের স্থলে বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদাতের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানগণ আজ পীর পূজা কবর পূজা নিয়ে মত্ত। তিনি বলেন, "আজ তাকওয়া তাহারতের (পবিত্রতার) অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। জেল খানায় গিয়ে দেখ দুর্বৃত্তের সংখ্যা কাদের বেশি। পরস্ত্রী গমন, মদ খাওয়া, পরের সম্পত্তি হরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যেন খোদা বলে কেউ নেই।"

অতঃপর ইসলামের বাইরের বিপদসমূহের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে তিনি বলেন, "বাহিরের বিপদ লক্ষ্য কর, সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট আছে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ইসলামের পরম শত্রু।" খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি বলেন, "খ্রীষ্টান পাদ্রী সম্প্রদায় তাদের এ উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, তারা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে খ্রীষ্টান করেছে। তিনি এ-ও উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের ভিতরেও এমন অনেকেই আছে যাদের চাল-চলন খ্রীষ্টানী আকিদাবিশিষ্ট যাদের কোন ধর্ম নেই। তাই তিনি দুঃখ করে বলেন, "এমন এক সময় ছিল যখন ইসলামের একটি লোক অন্য ধর্মে চলে গেলে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চলের উদ্ভব হ'ত, এখন ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে কোনই চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।"

মুসলিম সমাজের ভিতরের ও বাইরের এরূপ করুণ চিত্র তুলে ধরে তিনি প্রশ্ন করেন, ইসলামের হেফাযতের যে ওয়াদা আল্লাহ্‌পাক করেছেন, মুসলমানদের এরূপ নাজুক অবস্থায় সে ওয়াদা পূরণ না হলে আর কখন পূরণ হবে? অতঃপর বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনান্তে তিনি ঘোষণা দেন যে, ইসলামের হেফাযতের জন্য যথা সময়ে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লাহ্ পাক এ জামাত (আহমদীয়া মুসলিম জামাত) প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁকে (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে-তাঁর (আল্লাহ্‌তাআলার) মা'মুর (ধর্ম সংস্কারক) করে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের পর বলেন, "আমার স্থলে আর কাকেও ধর্ম সংস্কারকরূপে না দেখিয়ে আমাকে মিথ্যাবাদী বলার কোন অধিকার তাদের নেই। কারণ সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়েছে এবং যুগের অবস্থা বলে দিচ্ছে যে, ধর্ম সংস্কাকের আবির্ভাব আবশ্যক।" তিনি আরও বলেন, "সুতরাং যখন ধর্ম সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে, ধর্মের সংস্কার ও হেফাযতের বিধান আছে, তখন এ আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি এসেছেন,

তাঁকে গ্রহণ না করার পথ মাত্র দু'টি- হয় অন্য কোন সংস্কারক দেখিয়ে দিতে হবে আর না হয় কুরআন হাদীসের এ সমুদয় বাণীকে মিথ্যা বলতে হবে।"

তিনি বলেন, একজন বাগান বা ঘর প্রস্তুতকারী যেমন তার প্রস্তুতকৃত বাগান বা ঘরের যত্ন নেয়, শত্রুর হাত হতে রক্ষার চেষ্টা করে এবং বিভিন্নভাবে তার হেফাযতের ব্যবস্থা নেয়, তদ্রূপ সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্‌তাআলা প্রতি - নিয়ত তাঁর ধর্মের হেফাযত এবং প্রত্যেক বিপদ হতে রক্ষা করে আসছেন। এবং ইসলামের হেফাযতের আবশ্যকতার কারণেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে পাঠিয়েছেন।

যুগের অবস্থা ও হেফাযতের আবশ্যকতা সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি তৎকালে ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "ইসলামের বিরুদ্ধে কোটি কোটি পুস্তক প্রকাশ হচ্ছে। পাদরীগণ প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে ও প্রতি মাসে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন ও পত্রিকা প্রকাশ করছে তার তো ইয়ত্তাই নেই।" তিনি আরও বলেন, ইসলাম ধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানগণ হযরত রসূলে করীম (সঃ) ও তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণীদের বিরুদ্ধে যে সকল গালি প্রচার করেছে তা একত্র করলে বহু লাইব্রেরী পূর্ণ হবে। তিনি বলেন, এর পরও যদি কেউ বলে, ইসলামের কোন ক্ষতি হয় নি তবে বলতে হবে যে, ইসলামের সাথে তাদের কোন প্রাণের সম্পর্ক নেই। কিন্তু যাদের অন্তরে জ্যোতিঃ আছে, ইসলামের সাথে যাঁদের সম্বন্ধ ও মমত্ববোধ আছে তারা স্বীকার করবেন, বর্তমান যুগ একজন বিরাট মহাপুরুষের আগমনের উপযুক্ত সময়।

বর্তমান যুগই যে প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনের যুগ এর প্রমাণস্বরূপ তিনি ইসলামের ভিতর ও বাইরের অবস্থার উল্লেখ ছাড়া ও কুরআনের হিফাযত সম্পর্কিত সূরা হিজরের ১০নং ও সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াত (আয়াত ইস্তিখলাফ) তুলে ধরেন। এছাড়া সূরা মুয্যাম্মিলের ১৬নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাদৃশ্য ছিল, যা বাইবেল হতেও জানা যায়, তদ্রূপ হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারীদেরও সাদৃশ্য আছে। একই কারণে হযরত মূসা (আঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী তাঁর শেষ খলীফা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজনের আগমন অবশ্যই আবশ্যক; যিনি আদর্শ ও আত্মিক অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর তুল্য হবেন।

এরপর তিনি মূসায়ী মসীহ্ ও মুহাম্মাদী মসীহ্ (আঃ)-এর তুলনামূলক আলোচনাকালে উল্লেখ করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) যেমন তওরাত পূর্ণ করতে এসেছিলেন, তদ্রূপ মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ) অর্থাৎ তিনি নিজে কুরআনের শিক্ষাকে সজীব করতে এসেছেন; যাকে তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াত বা সত্যের পূর্ণ প্রচার বলা হয়।

সত্যের পূর্ণ প্রচার সম্পর্কে বলতে যেয়ে তিনি বলেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর উপর ইসলাম ধর্ম পূর্ণ হয়েছিল, যার দু'টি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম 'তকমীলে হেদায়াত' বা ধর্মের বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা। দ্বিতীয় অংশের নাম 'তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াত' বা ধর্মের পূর্ণ প্রচার। তিনি এ-ও জানান যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে 'তকমীলে হেদায়াত' বা বিধি-ব্যবস্থার পূর্ণতা লাভ হয়েছিল এবং তকমীলে ইশায়াতে হেদায়াত তাঁর দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণ হবে যার ভবিষ্যদ্বাণী সূরা জুমুআর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আয়াতে করা হয়েছে। এ আয়াত হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বুরুজী রংয়ে এমন একজন আসবেন যাঁর মাধ্যমে সত্যের পূর্ণ প্রচার হবে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমান যুগেই প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় সকল সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়ে প্রচার সহজতর করেছে। যেমন ছাপাখানা, ডাক ও তার ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ, সংবাদপত্র প্রভৃতি যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যম সৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী একটি শহরে পরিণত হয়েছে। যার ফলে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পূর্ণ প্রচারের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

তাঁকে হযরত ঈসা (আঃ) নাম প্রদান করার আরও কিছু যুক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে তিনি বলেন, ইহুদীরা যেমন তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ভুলে তাদের হাদীস গ্রন্থ তালমূদ ও আলেমদের কথার উপর বেশি নির্ভর করত। মুসলমানগণও তেমনি তাদের ঐশী গ্রন্থ কুরআনের পরিবর্তে রেওয়ায়াত ও কিস্‌সা কাহিনীর উপর বেশি জোর দিচ্ছে। এ ছাড়া শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়েও একটি সাদৃশ্যের কথা তিনি উল্লেখ করেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় রোমীয় শাসন ও তাঁর সময়ের ইংরেজ শাসন উভয়ই ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে বিখ্যাত। হযরত ঈসা (আঃ) ও তিনি উভয়ই নিজ নিজ শরীয়তি নবীর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছেন। হযরত ঈসা (আঃ) যেমন নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিতেন এবং জিহাদ সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করেন। ধর্মের জন্য যেমন তিনি অস্ত্র ধরেন নি। তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যও বিধিবদ্ধ ছিল যে, তিনি ইসলামের সৌন্দর্য প্রমাণ করবেন ও জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করবেন। যার জন্য হাদীস শরীফে এসেছে যে, তিনি ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন।

এ সকল সাদৃশ্যের উল্লেখপূর্বক তিনি ঘোষণা দেন, "এখন সুধীগণ এ সকল কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে দেখুন, আমার কথাগুলো কি উপরে উপরে চোখ বুলিয়ে ছেড়ে দিবার যোগ্য কিংবা ভালরূপে বুঝবার বা অনুধাবন করবার উপযুক্ত? আমার দাবী কি শতাব্দীর শিরোভাগে নয়। শতাব্দীর শিরোভাগ যখন এসেছে, তখন আমি না আসলে আর কেউ আসতেন। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের তাঁকে অনুসন্ধান করা উচিত। অতঃপর তিনি জানান, যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদের আগমনের সংবাদ কুরআন হাদীসে বিভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। তিনি বলেন, "সুতরাং আমি আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি, বিষয়টিকে ছোট খাট ব্যাপারাদির মত মনে করবেন না। এর সম্পর্ক ঈমানের সাথে বেহেশত-দোযখ এ কথার সাথে সংযুক্ত।"

এর পর তিনি বলেন, তাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-কেই অগ্রাহ্য করা বুঝায়। কেননা, আল্লাহ্ তাঁর পাক কালামে কুরআনের হেফাযত ও খেলাফতের ধারাবাহিকতার ওয়াদা করেছেন অথচ বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তার কোন ব্যবস্থা নেই এবং মুসলমানের ভিতর কোন খিলাফত নেই। এছাড়া কুরআন পাকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তুলনা করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন মসীহ্ (আঃ) এসেছিলেন, এ তুলনা বজায় রাখার জন্য হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন মসীহ্ (আঃ)-এর আসা আবশ্যক। এভাবে সূরা জুমুআর আয়াত **আখারীনা মিনহুম** আয়াতাংশ অনুযায়ী হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর একজন বুরুজ আসার কথা। তিনি দাবীর সাথে বলেন, তাঁকে অস্বীকার করতে হলে উপরের বিষয়সমূহই নয়, কুরআন শরীফের আলহামদু হতে আন্নাস পর্যন্ত সমস্ত কুরআনকেই অস্বীকার করতে হবে।

তিনি বলেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলায় শুধু কুরআন নয় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কেও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। কেননা, তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আসার সংবাদ দিয়েছেন, তা ভুল প্রমাণিত হবে। তাছাড়া তিনি [হযরত রসূলে করীম (সঃ)] তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের ইমাম হবেন" বলে যে সংবাদ দিয়েছেন তা-ও ভুল প্রমাণিত হবে।

তিনি জানান, হযরত রসূল করীম (সঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-কে 'ইয়াকসিরুস সালী-

ব' বা ক্রুশ ধ্বংসকারী বলায় প্রতীয়মান হয়, তিনি ক্রুশীয় মতবাদ প্রবল হবার সময় আগমন করবেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ক্রুশ ধর্ম প্রবল হয়েছে অথচ প্রতিশ্রুত ইমাম নেই, তাহলে কার্যতঃ হযরত রসূলে করীম (সঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হলেন না কি? (নাউযুবিল্লাহ্)।

তিনি বলেন, হাদীস শরীফে যেমন ইয়াকসিরুস্ সালীব' প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর একটি কাজ বলা হয়েছে তদ্রূপ 'ইয়াজাউল হারব' তাঁর অপর একটি কাজ বলে উল্লেখিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, "এ শেষোক্ত কাজের জন্য জিহাদ হারাম বলে ফতওয়া দেয়া আমার কাজ ছিল। অতএব আমি বলছি, বর্তমান যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণ করা হারাম ও ভীষণ পাপ। সীমান্ত প্রদেশের অসভ্য লোকেরা জিহাদের নামে ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে। এরূপে শান্তি নষ্ট করে তারা ইসলামের দুর্নাম রটাচ্ছে।"

অতঃপর ক্রুশ ধ্বংসের ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু দ্বারাই ঐ ধর্মকে নির্মূল করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে ক্রুশও ধ্বংস হয়েছে। তিনি বলেন, "একথা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নি কাশ্মীরে আসার পর স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তখন ক্রুশ ধ্বংসের আর কি অবশিষ্ট আছে, তা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমাকে বলে দিবেন কি?" ক্রুশ ধ্বংসের তাৎপর্য বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বলেন, "ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ কাঠের বা অন্য কোন জিনিসের তৈরী ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা নয়। ক্রুশীয় ধর্মকে পরাভূত করাই ক্রুশ ধ্বংসের প্রকৃত অর্থ।"

তিনি আলেম সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন, যদি তারা বারাবারি না করে শান্ত মনে সব কিছু চিন্তা করে দেখত তবে তাঁর অনুসরণ করা ব্যতীত তাদের আর কোন পথ থাকত না। তিনি আরও বলেন, তারা যদি খ্রীষ্ট ধর্মের উপদ্রব লক্ষ্য করত তবে দেখতে পেত যে, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কখনও দেখা দেয় নি। এমনকি এর পূর্বের আগমনকারী কোন নবীর সময়ই এরূপ বিপদ আসে নি। খ্রীষ্টানগণ বিভিন্নভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি বক্তৃতা বিভিন্নভাবে তারা ইসলামের প্রতি লোকদের বীতশ্রদ্ধ করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এমনকি চিকিৎসার মাধ্যমেও তারা লোকদের খ্রীষ্টান বানানোর চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। হুযূর (আঃ) বলেন, খ্রীষ্টানদের হাত ইসলামের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করে পাঠিয়েছেন এবং হাদীস শরীফে তাঁর নাম "কাসিরুস্ সালীব" বা "ক্রুশ ধ্বংসকারী" রাখা হয়েছে।

এর পর তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের সময়ের কিছু লক্ষণাদি যেমন আকাশ হতে অবতরণ, দজ্জাল বধ, সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেন। অতঃপর তিনি 'নযূল' শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, "শব্দ কখনও ধাতুগত মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আলংকারিকভাবে অন্য অর্থে ব্যবহৃত" হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব (সঃ) সম্পর্কিত রূপকভাবে বর্ণিত একটি হাদীস এবং কুরআনের আয়াতঃ "যে ইহকালে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ হবে তুলে ধরে বলেন, "অলীক খেয়ালের বশবর্তী হয়ে শব্দের যদি প্রকাশ্য অর্থই গ্রহণ করা হয় তবে দৃষ্টি শক্তিহীনদের মুক্তির আশা পরিত্যাগ করতে হবে।" এর পর তিনি রূপকের ব্যবহারকৃত আরও কতিপয় হাদীস ও কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "আশ্চর্যের বিষয় এটা, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা একথা ভুলে গিয়ে শব্দের প্রকাশ্য অর্থের উপর জোর দেয়।" তিনি আরও বলেন, "ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষায় যদি রূপকের অস্তিত্ব স্বীকার করা না হয় তবে কোন কোন নবীর নবুওয়ত প্রমাণ করা অতি কঠিন হয়ে পড়বে।" প্রসঙ্গত তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কিত ইহুদীদের বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ইহুদীদের ভ্রমের কারণ তারা হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করতে পারে নি। তিনি বলেন, বর্তমান মুসলমানগণও ইহুদীদের ন্যায় ভ্রমে পড়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ২য় আগমন সম্পর্কিত হাদীসের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করাতেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অনুমান করতে পারেন যে, কোন নবীর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন রূপকভাবে পূর্ণ হয়, হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সেভাবেই পূর্ণ হবার কথা।"

এভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কিত মুসলমানের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার পর তিনি নবীদের ন্যায় তাঁর দাবীও পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "পরীক্ষারূপ যন্ত্রে পিষ্ট হওয়া ব্যতীত ঈমানের স্বরূপ প্রকাশ পেতে পারে না।" তবে তিনি বলেন, "যারা দৃঢ় সম্ভাবনা দেখেই চিনে নেন, তাঁরাই শ্রেষ্ঠতম মু'মিন (বিশ্বাসী)বলে পরিগণিত হন। তাঁদের মর্যাদা অনেক বেশি।"

তাঁর দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ খোদাতাআলা কর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শনাদির উল্লেখ করেন। তাঁর দাবীর সত্যতা যাচাইকারীদের বলেন, "আমার সম্বন্ধে যদি তাকওয়ার (খোদা-ভীতি) সাথে কাজ করা হ'ত তবে তারা এ কথাই বলত এবং লক্ষ্য করত যে, খোদাতাআলা আমাকে সাহায্য করেন কিংবা আমার জামাত ধ্বংস করেন।"

তিনি বলেন, পরীক্ষার তিনটি বিষয় আছেঃ প্রথম কুরআন, দ্বিতীয় সুন্নত ও তৃতীয় হাদীস। কুরআন আল্লাহ্র বাণী। সুন্নত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুষ্ঠিত কাজ আর হাদীস রসূলে করীম (সঃ)-এর বহু পরে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়। রসূলে করীম (সঃ)-এর সময় হতে হাদীস সংকলনের পূর্ব পর্যন্ত কুরআন ও সুন্নত দ্বারাই ইসলামের যাবতীয় বিধান পরিচালিত হ'ত। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা সুন্নত ও হাদীস এক করে ফেলেছেন। অথচ কুরআন ও সুন্নত দ্বারা পরীক্ষা না করে হাদীসকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি বলেন, প্রচলিত হাদীসের পরীক্ষার নিয়মানুযায়ী হাদীস যতই দুর্বল বা নিম্নশ্রেণীর হোক না কেন কুরআন ও সুন্নতের বিপরীত না হলে, তা ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলেন, তাঁরা বিচার করে দেখুন কুরআন ও সুন্নতই শ্রেষ্ঠ না লোকের নির্ধারিত নিয়ম শ্রেষ্ঠ। হাদীস প্রণেতাগণ কেউই একথা বলেন নি। খোদার বাণী পেয়ে তারা হাদীস পরীক্ষার নিয়ম উদ্ভাবন করেছেন। কুরআন হাদীস ব্যতীত যদি অন্য কোন মাপকাঠি থাকত তবে শিয়া-সুন্নীদের হাদীসসমূহ সঠিক বলে স্বীকার করা হয় না কেন, বলে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

এ সম্পর্কে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর 'ইশাআতে সুন্নাহ্' নামক পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনিও স্বীকার করেছেন, "আহলে কাশ্ফ" বা আত্মিক দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মুহাদ্দিসগণের কল্পিত নিয়মে অধীন নন এ সকল নিয়মের দুর্বল হাদীসকে তাঁরা বিশ্বস্ত এবং বিশ্বস্ত হাদীসকে দুর্বল বলতে পারেন। কারণ তাঁরা সাক্ষাৎভাবে খোদা ও রসূলের নিকট হতে সংবাদ পেয়ে থাকেন। এর সূত্র ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, আগমনকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও এরূপ আহলে কাশ্ফ হবেন বিধায় হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাঁকে হাকাম বা ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারী বলেছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, খোদার তরফ হতে জ্ঞান লাভ না করলে বা তাঁর উপর হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর আত্মিক প্রভাব না থাকলে তিনি কীভাবে মীমাংসাকারী হবেন?

ভবিষ্যতে আগমনকারী সম্পর্কিত সকল হাদীস পূর্ণ হতে হবে এরূপ ধারণায় বিশ্বাসীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তাদের এরূপ ধারণা, সঠিক নয়। তাঁর এ কথা অনেকেই যে সমর্থন

করেন তার উদাহরণ পেশ করে তিনি বলেন, "সমস্ত হাদীসই যদি পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন, শিয়াদের হাদীস, সুন্নীদের হাদীস এরূপ সকল সম্প্রদায়ের সকল হাদীসই যদি পূর্ণ হতে হয় তবে নিশ্চয় স্মরণ রেখ যে, মসীহ্ (আঃ) বা মাহদী (আঃ) কেউই কখনও আসবেন না।' বিবেচনা কর আমার চেয়ে রসূলে করীম (সঃ) -এর আবশ্যকতা অনেক বেশি ছিল। তিনি যখন আসলেন, সকলেই কি তাঁকে মেনে নিয়েছিল? তওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থে তাঁর আগমনের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত ছিল, তার সবগুলো কি পূর্ণ হয়েছিল?" এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "জেনে রেখ, সমুদয় লক্ষণ কখনও পূর্ণ হয় না, কারণ কতক লক্ষণ লোকদের কল্পিত, আর কতগুলো কল্পিত না হলেও উহার ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। নবী মাত্রকেই অস্বীকার করা হয়েছে এবং অজুহাত দেখান হয়েছে যে, সমুদয় লক্ষণ পূর্ণ হয় নি। এখনও মানুষ এ চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করছে।"

তিনি তাঁর বিরোধীদেরকে আহওয়াল অর্থাৎ এককে দুই দেখে বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা একই প্রকার হাদীস বার বার পেশ করে। অথচ কুরআনের উপর হাদীসের কোন স্থান নেই। তিনি বলেন, তাঁর দাবীর প্রমাণ চাইবার অধিকার তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের আছে। যে জন্য তিনি কুরআন, হাদীস ও তাঁর প্রদর্শিত অলৌকিক ক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি মিথ্যা দাবী করতাম নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে ধ্বংস করতেন। কিন্তু আমার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বস্তুত তাঁর নিজস্ব কাজ, আমি তাঁরই পক্ষ হতে এসেছি।

তিনি হাদীস শরীফে হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে হাকাম বলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে হাকাম বলায় এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, তখন মতভেদ খুব বেশি হবে। এ সম্পর্কে তিনি নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ প্রদত্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেব বলেছেন, হাকাম কুরআনের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিবেন কারণ হাদীসে মানুষের হাত লেগেছে। আর কুরআন আল্লাহ্র অপরিবর্তনীয় বাণী। সুতরাং কুরআনের সাথে হাদীসের তুলনা হতে পারে না। তিনি বলেন, আবার চিন্তা করে দেখুন, আঁ হযরত (সঃ) কি নিজের তত্ত্বাবধানে হাদীস লিখবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিংবা কুরআন শরীফের?" তিনি আরও বলেন, "আঁ হযরত (সঃ) একথা বলেন নি, আমি তোমাদের জন্য হাদীস রেখে যাচ্ছি। বরং তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য কুরআন রেখে যাচ্ছি।"

অতঃপর তিনি সূরা ফাতেহায় উল্লেখিত মাগযুব ও যাল্লীনদের সম্পর্কে বলেন, তফসীরকার মাত্রেই উল্লেখ করেছেন যে, মাগযুব ও যাল্লীন বলতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বুঝাচ্ছে তিনি এ-ও জানান, মুসলমানদের ইহুদী ও খ্রীষ্টান সদৃশ্য হবার সম্ভাবনা থাকার জন্যই এ দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ-ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যেভাবে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ না করে অভিশপ্ত হয়েছে, তদ্রূপ দ্বিতীয় ঈসা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে অগ্রাহ্য করে তারাও যেন ইহুদী সদৃশ্য না হয়। আরও প্রতিভাত হয়, মুসলমানদের জন্য বড় ফেতনা দজ্জালের কথা না বলে খ্রীষ্টানদের কথা বলায় খ্রীষ্টানগণই যে দজ্জাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, দজ্জালের উপদ্রব ক্রুশীয় উপদ্রব হতে স্বতন্ত্র কিছু নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তা-ই বলেন, "এ উম্মতে যদি এ বিপদ আসার সম্ভাবনা না থাকত তবে এ দোয়া শিক্ষা দিবার অর্থ কী? সব চেয়ে বড় বিপদ দাজ্জালের। অথচ অলায্যাল্লীনের স্থলে অলাদ্দাজ্জাল বলা হয় নি কেন?

খ্রীষ্টানগণই যে ভয়ঙ্কর বিপদ তার সত্যতা যাচাই এর জন্য গির্জার কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি প্রদানের পরামর্শ দিয়ে তিনি কুরআন তথা ধর্মের হেফাযতের সাতটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

১। হযরত মূসা (আঃ)-এর সদৃশ নবী যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন, তদ্রূপ মূসায়ী খিলাফতের তুল্য খিলাফত অবশ্যই উম্মতে মুহাম্মাদীয়াতেও থাকবে।

২। সূরা নূরের আয়াত ইস্তিখলাফের ওয়াদানুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর সামঞ্জস্যতা রক্ষার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুরূপ মুহাম্মাদী উম্মতেও একজন শেষ খলীফা থাকা আবশ্যক।

৩। হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদী উম্মতের ইমাম বা নেতা বাইর হতে কেউ হবে না।

৪। শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ আগমনের ওয়াদানুযায়ী বর্তমান শতাব্দীর (চতুর্দশ) ও একজন মুজাদ্দিদ থাকা আবশ্যক। অনাচার দূর করা যার কাজ এবং ক্রুশীয় মতবাদ বর্তমানে বড় অনাচার হওয়ায় বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদকে ক্রুশ ধ্বংসকারী হওয়া আবশ্যক।

৫। হযরত মূসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা হযরত ঈসা (আঃ) যেমন তাঁর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছিলেন, তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর শেষ খলীফা আসা আবশ্যক।

৬। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের লক্ষণসমূহের অনেকগুলো যেমন (ক) একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হওয়া (খ) হজ্জ স্থগিত থাকা (গ) দুই শিং বিশিষ্ট তারকার উদয় (ঘ) প্লেগের প্রার্দুভাব (ঙ) রেলগাড়ীর প্রচলন, (ঞ) উটের ব্যবহার উঠে যাওয়া ইত্যাদি পূর্ণ হয়েছে।

৭। সূরা ফাতিহার দোয়ার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন উম্মতের মধ্যে আগমন হওয়া প্রমাণিত।

অতঃপর তিনি ঘোষণা দেন, "এখন আমি খোদাতাআলার ওহী ও ইলহাম অনুযায়ী ঘোষণা করছি, যার আসার কথা ছিল, সে নিশ্চয় আমি। আদিকাল হতে আল্লাহ্ নবীগণের পরীক্ষার জন্য যে নিয়ম রেখেছেন, তদনুযায়ী যার ইচ্ছা আমার নিকট হতে প্রমাণ গ্রহণ করুক ও আমার অনুকুলে যে সকল নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা নিরীক্ষণ করুক।"

তিনি তাঁর দাবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ঘটনার উল্লেখ করেন (যা ১৯৯৪ সনে পূর্ব ও ১৯৯৫ সনে পশ্চিম গোলার্ধে পূর্ণ হয়েছে-লেখক)। হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেন, তাদেরকে তিনি বলেন, "তারা বলে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের হাদীসটি প্রমাণিত নয়। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হোক, ঘটনার দ্বারা খোদাতাআলা যে হাদীসকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন, তাদের মুখের কথায় কি তা মিথ্যা হয়ে যাবে?

সর্বশেষ তিনি পুনরায় নবী-রসূলদের পরীক্ষা করার ন্যায় তাঁকে পরীক্ষা করার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, "চিন্তা করে দেখ, খোদাতাআলার নিকট দোয়া করতে থাক। তিনি শক্তিমান, তিনি পথ দেখিয়ে দিবেন। তাঁর সাহায্য সত্যবাদীগণই পেয়ে থাকেন।"

এভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। পুস্তিকাটিতে তাঁর প্রদত্ত যুক্তি-প্রমাণ ও খোদার প্রতি জোরালো অবিচল আস্থা তাঁর দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

- খোন্দকার আজমল হক

# এস হাদীস শিখি

(চতুর্থ কিস্তি)

### (৫) দান-খয়রাতের গুরুত্ব

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

(ইত্তাকুন্নারা ওয়া লাও বিশিক্বিন তামরতিন)

অর্থ ঃ খেজুরের একটা টুকরো (সদকা) দিয়ে হলেও আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। সদকা এর অন্যতম। এ হাদীসে হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সামান্য পরিমাণ দান এর দাতাকে এ দুনিয়া ও পরকালের কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, সদকা অর্থ হলো স্বেচ্ছামূলক দান যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে করা হয়। কারও সৎভাবে অর্জিত অর্থ থেকে দান করা আবশ্যক। দান করে খোঁটা দেয়া বা গ্রহীতাকে কোন বাধ্য-বাধকতার মধ্যে রাখা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী (সূরা বাকারা ঃ ২৬৩ ও ২৬৫)।

এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, কেউ যদি দান করার সামর্থ্য না রাখে তাহলে অভাবী ব্যক্তির সাথে তার সুন্দর আচরণ করতে হবে। এটাও সদকার নামান্তর (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪ আয়াত এবং পরবর্তী হাদীসটি দ্রষ্টব্য)।

### (৬) একটি ভাল কথা

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ۔ (بخاری)

(আল্ কালিমাতুত্ ত্বায়্যিবাতু সদাক্বাতুন)

অর্থ ঃ একটি ভাল কথা দানস্বরূপ।

ব্যাখ্যা ঃ তুমি যদি কাউকে একটি পুণ্য কাজের বিষয়ে বল আর তাকে তা করার জন্যে উৎসাহ দাও এবং এর ফলে তার মাঝে একটি পরিবর্তন সৃষ্টি হয় আর সে-ও সৎ কাজ করে তাহলে তার পুণ্যের অংশ তোমারও লাভ হবে। তাকে ভাল কথা বলা এরকম যেন তুমি স্বয়ং দান-খয়রাত করেছো বা কোন পুণ্য কাজ করেছো। কুরআন শরীফের সূরা বাকারার ২৬৪ আয়াতে বলা হয়েছে, উত্তম কথা (বলা) এবং (অপরাধ) ক্ষমা করা ঐ দানের থেকে উত্তম যার পরে কষ্ট দেয়া আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সকলের ভাল আচরণ করা উচিত। কেননা, এতে কোন পয়সা লাগে না।

### (৭) সামান্যও যথেষ্ট হয়ে থাকে

مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى

(মা ক্বাল্লা ওয়া কাফা খায়রুম্মিম্মা কাছুরা ওয়া আলহা)

অর্থ ঃ স্বল্প জিনিষ প্রয়োজন পুরো হলে তা সেই অধিক জিনিষ থেকে উত্তম যা (খোদা থেকে) অমনোযোগী করে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ এ সংক্ষিপ্ত হাদীসটি আমাদের সাদা-সিদা জীবন যাপন ও স্বল্পে-তুষ্টতা শিখাচ্ছে। আর অপচয় ও বাহুল্য খরচ পরিহার করার শিক্ষা দিচ্ছে। কেউ যদি তার জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে চায় আর মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার পেছনে ছুটে তাহলে তাকে অবৈধ আয় ও ব্যয়ের সীমাহীন পাঁকে জড়িয়ে পড়তে হবে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যকে সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় না। অন্য আর একটি হাদীসে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে- সাদা-সিদা জীবন যাপন ঈমানের অংশ। তেমনিভাবে কুরআন করীমের সূরা আল্ আ'রাফ-এর ৩২ আয়াত এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ২৮ আয়াতে অযথা ব্যয় না করার জন্যেও তাগিদ দেয়া হয়েছে।

### (৮) কথা বলার আগে চিন্তা কর

اَلْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

(আল্ বালাউ মুয়াক্কালুন বিল মানত্বিক্)

অর্থ ঃ (চিন্তা না করে) কথা বল্লে বিপাকে পড়তে হয়।

ব্যাখ্যা ঃ মুখ থেকে কথা একবার বের হয়ে গেলে এর ভাল বা মন্দ প্রভাব কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সুতরাং এ হাদীসে চিন্তা করে কথা বলার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আবার কথা যদি সংক্ষিপ্ত ও কোমল প্রকৃতির হয় তাহলে কথার মাঝে নিহিত সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও অনেকটা সহ্যের সীমার মধ্যে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়-বস্তু অন্য একটি হাদীসেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ লজ্জাশীলতা ও কম কথা বলা ঈমানের দু'টি বৈশিষ্ট্য। আল্ কুরআনও পরামর্শ দিচ্ছে ঃ তোমরা লোকের সাথে সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলবে (সূরা আল্ বাকারা ঃ ৮৪ আয়াতাংশ)।

### (৯) দান ফেরৎ নেয়া ভাল নয়

اَلرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ

(আর রাজি'উ ফী হিবাতিহী কাররাজি'ই ফী ক্বায়ইহী)

অর্থ ঃ উপহার দিয়ে তা যে ফেরৎ নেয় তার অবস্থা সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজে বমি করে তা চাটে।

ব্যাখ্যা ঃ পরস্পরের উপহার ও দান-সামগ্রী আদান-প্রদানের মাধ্যমে একে অপরের মাঝে সম্প্রীতি ও ভালবাসা বাড়িয়ে দেয়। একবার উপহার দেয়ার বা দান করার পরে তা ফেরৎ নেয়া খুবই সংকীর্ণ মনের ও কৃপণতার পরিচয় বহন করে। কুরআন করীমের সূরা নিসার ২১ আয়াত এবং সূরা আল্ হাদীদের ২৫ আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

# আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাতিল কারা

ইসলামে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার স্বহস্তে গড়া চির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা কখনও এর ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। আহমদী মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে যে-ই মিথ্যার পাহাড় গড়ে তোলার চেষ্টা করুক না কেন ধূলি-বালির ন্যায় সে বিলীন হয়ে যাবে। দুনিয়ার কোন শক্তি নেই আহমদী জামাতের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারে। কেননা, এ স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলার কাজ। দুনিয়ার বুকে একই ধর্ম হবে আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ইসলাম এবং একই নেতা হবে বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। আগুনের নিকট যেমন বরফ গলে যায় তদ্রূপ সত্যের কাছে মিথ্যা কখনও টিকতে পারে না, সত্য মিথ্যাকে দূর করে। মিথ্যা অন্ধকার সদৃশ। আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন দ্রুত পলায়ন করে তদ্রূপ সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা দ্রুত পলায়ন করে। মিথ্যা বিশ্বাস মানব-হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতঃ অনবরত অন্যায় ও অসৎ চিন্তা-ভাবনায় মানুষকে মন্দ ও অসৎ কাজ-কর্মে সর্বদা উৎসাহিত করে। তখনও মিথ্যা কথাই তার রক্ত-মাংসে মজ্জাগত হয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত

হয় এবং নিজেকে নির্দোষ মনে করতঃ সত্যের বিরোধিতা করে তার মনে আনন্দ পায়। একটা মিথ্যাকে দুনিয়ার সমস্ত লোকও যদি সত্য বলে, তাহলে মিথ্যা কখনোও সত্যে পরিণত হয়ে যাবে না। আর একটা সত্যকে দুনিয়ার সমস্ত লোকও যদি মিথ্যা বলে, তাহলে সত্য কখনও মিথ্যা হয়ে যাবে না। দৃষ্টান্তস্থলে যেমন, খ্রীষ্টানগণ বলে, মরিয়ম-পুত্র যীশু ঈশ্বরের একমাত্র জাতপুত্র। তাদের বিশ্বাসে ঈশ্বর-পুত্র যীশু (ঈসা-আঃ) ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্য করতঃ স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। আবার তিনি পৃথিবীতে নেমে এসে জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। খ্রীষ্টানদের এটা একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা কথা। আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে ইহা বাতিল, অতিশয় ঘৃণিত ও জঘন্যতম কথা। ইহা কখনও সত্যে পরিণত হবে না। তেমনিভাবে ইসলামের নামধারী আলেম- ওলামা মুফতী মাওলানা ও খতীব সাহেবগণ খ্রীষ্টানদের সাথে বুকে বুক দিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে বলে, খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা-আঃ) মরেন নি। অদ্যবধি আসমানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত সশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে মুসলমান জাতিকে দজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। উক্ত বিশ্বাস ক্রুশীয় মতবাদ। আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে এ ক্রুশীয় মতবাদ বাতিল। কুরআন হাদীসের বিরোধী যুক্তি-প্রমাণহীন অবান্তর আজগুবি ধ্যান-ধারণা মিথ্যা কল্প-কাহিনী। ইহা কখনও সত্যে পরিণত হবে না। এরূপ ক্রুশীয় মিথ্যা মতবাদ শিরক বিদ'আতের মূল উৎপাটন করতঃ সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার নিমিত্তে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে সঠিক সময়ে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলে তিনি এসে আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশক্রমে খ্রীষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা-আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করতঃ কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় চরম মিথ্যা মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি জগতের সম্মুখে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, "স্মরণ রাখিও, কেহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তাহারা সকলে মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। অতঃপর তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবেন। অতঃপর তাহাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহারাও মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িবে। এবং আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হইবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ঐ মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হইবে এবং একই নেতা। আমি তো এক বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়াছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বিকশিত হইবে কেহ ইহাকে রুখিতে পারিবে না" (তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাইন)। আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলাম। এর পুরোপুরি অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌-তাআলার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা সবকিছুতেই তাঁর উপর আত্মসমর্পণ। এরূপ আত্মসমর্পণকারীকে বলা হয় অনুগত বা মুসলমান। যারা সংসারের মোহমায়া লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি নিজ নিজ স্বার্থকে পরিত্যাগ করতঃ এবং একমাত্র মহান আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি আত্মসমর্পণ করতে পারবে তাদের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের ছায়া। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তোমরাই বিজয়ী হবে তোমাদেরই প্রাধান্য রবে যদি তোমরা মু'মিন হও"।

প্রশ্ন এই যে, মুসলমানগণ নামায পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জব্রত পালন করে, তবুও তারা আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে সকল জাতির কাছে অবহেলিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এটা কোন্ পাপের ফল? মু'মিন হওয়ার শর্ত আরোপ করে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (খেলাফতকে) শক্ত করে ধরবে আর শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত করবে তারাই হবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ শীঘ্রই মু'মিনগণকে মহা পুরস্কার দিবেন" (সূরা নিসা)। কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণের খেলাফত থাকবে। যার মাধ্যমে একতা ভ্রাতৃত্বে পরিপূর্ণ সহানুভূতি ও সংহতি বজায় থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত, আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না। আর তোমরা সকলে মিলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (খেলাফতকে) শক্তভাবে ধারণ কর। (সাবধান) দলে দলে বিভক্ত হয়ো না" (সূরা আলে ইমরান)। আল্লাহ্‌র উপরোক্ত পবিত্র বাণী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যারা খেলাফতকে অমান্য অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতঃ দলে দলে বিভক্ত হবে তাঁরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাতিল।

ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, বনী ঈসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ভিন্ন বাহাত্তরটি দলই বাতিল অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, সেই একটি দল কোন্‌টি? উত্তরে হুযূর (সঃ) বললেন, "আমার ও আমার সহচরগণের স্বীকৃত মতাদর্শের অনুগামীগণের দল"।

সর্বজনবরেণ্য মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেছেন, সেই বাহাত্তরটি দলই হবে বাতিল অর্থাৎ জাহান্নামী। আর একটি মাত্র খাঁটি মুক্তিপ্রাপ্ত জামাত হবে যা আহমদীয়ত নামে খ্যাতি লাভ করবে (মিরকাত, শরাহ্ আল্ মিশকাত দ্রষ্টব্য)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, ইসলামের শিক্ষানুসারে যে বা যারা কাউকে বাতিল বা মিথ্যুক বলে ফতওয়া দিবে, যার প্রতি ফতওয়া দেয়া হবে, সত্যিকারভাবে যদি বাতিল বা মিথ্যুক না হন, তাহলে ফতওয়াদাতা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বাতিল বা মিথ্যুকরূপে পরিগণিত হবে। দল-মত নির্বিশেষে আখেরী জমানায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনে সকলেই বিশ্বাসী। আজ থেকে একশ' বছর আগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর দাবী করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশক্রমে আহমদী জামাত নামে এক সংগঠন স্থাপন করতঃ ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের পথ খুলে দিয়েছেন। এক মাত্র আহমদী জামাতের প্রচারকগণই সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের দ্বারা অমুসলমানগণকে মুসলমান বানিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে বিশ্ব নবীরূপে প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিয়োজিত। খোদা-ভীরু ধর্মপরায়ণগণের উচিত বিবেকের কষ্টি পাথরে তাঁর সত্যাসত্য যাচাই করে দেখা। যদি তিনি সত্যবাদী হন, নিশ্চয়ই তিনি সত্যবাদী, এমতাবস্থায় যদি তাকে অমান্য করা হয়, তাহলে স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে অমান্য করা হয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তাআলাকে অমান্য করা হয়। কেননা, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য-কর্তব্য। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর কঠোর নির্দেশ, যে ব্যক্তি তাঁকে গ্রহণ না করে মৃত্যু লাভ করবে তার মৃত্যু জাহেলিয়তের। তিনি যত বড় আলেম-ওলামা মুফতী মাওলানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদের দাবীদারই হোন না কেন, যুগ-ইমামের হাতে বয়াত না করে মৃত্যু লাভ করলে তাঁর মৃত্যু জাহেলিয়তের।

পরিশেষে প্রার্থনা করি অন্তরে জমাকৃত হিংসা-বিদ্বেষ নামক বিষ-বাষ্পের ধূম্রজাল দূরীভূত করতঃ সত্যকে চিনার, জানার, বুঝার এবং গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে তৌফীক দান করুন, আমীন।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

# মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তার বংশের পরিণতি

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

এরপর তার মেয়েদের সন্তানদের মধ্যে এমন উল্লেখযোগ্য কেউ নেই। এমন একজনও পাওয়া যাবে না যার কোন ভাল কাজের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধর্ম থেকে সবাই দূরে সরে গেছে। আমাদের বংশের মধ্যে একটি বিষয় যা লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে ঃ যে কেউ এ বংশের সাথে সম্পর্ক করেছে সে হয় যৌবনেই মারা গেছে অথবা তার তালাক হয়ে গেছে। এদের সকলের নামের তালিকা আমার কাছে আছে কিন্তু এখন আমি তা প্রকাশ করতে চাই না।

তার (মৌঃ মোঃ হোসেন বাটালবী) বংশের যা কিছু এখন অবশিষ্ট তা হচ্ছে লাহোরে তাকিয়া সরদার শাহ নামক একটা মহল্লা আছে যা টেম্পু রোড এবং ফিরোজপুর রোডের মাঝামাঝি, সেখানে দু'টি ছেলে এখনও বেঁচে আছে যাদেরকে মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের বংশের লোক বলতে পারেন অর্থাৎ তার প্রপৌত্র। একজনের নাম ফারুক, অপর জনের নাম ওয়ায়েস। ফারুক তো হিরোইন সেবক। একবার সে ছয়মাসের জেলও খেটেছে। আর ওয়ায়েস তো পুরুষ নয় অর্থাৎ সে হিজড়া।

কথা তো অনেক আছে কিন্তু এ অল্প সময়ে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, একে তো মিথ্যাবাদী তারপর আবার এ কথা বলা যে, আমিই একে (হযরত মসীহ্ মাওউদ-আঃ) সম্মান দিয়েছি আর আমিই একে নীচে নামাব। এখন আপনাদেরকে দেখতে হবে আল্লাহ্তাআলা কাকে অপদস্থ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সন্তানাদির মধ্যে কি কেউ অপদস্থ হয়েছেন? নাকি তাঁর তবলীগের মধ্যে কোন ঘাটতি এসেছে। অপরদিকে মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর সম্মানের কি কোন উন্নতি হয়েছে? তার তো বংশই একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

## প্রশ্ন উত্তর পর্ব

**প্রশ্ন ঃ** আপনি কবে কীভাবে আহমদী হলেন?

**উত্তর ঃ** ১৯৬৭ তে একদিন বাইরে ঘোরাফেরা করছি এমন সময় এক আহমদী বন্ধু মোবারকের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নবী এসেছে' 'নবী এসেছে' বলে আপনারা এ কি হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আমরা একজনকে ইমাম মাহ্দী হিসাবে মানি, এখন আপনারা ইমাম মাহ্দীকে যা বলতে চান বলুন।' যাই হোক কিছু কথা তার সাথে হ'ল। এরপর আমি তার কাছ থেকে বই-পত্র নিতে থাকলাম। ১৯৬৭ সালেই আমার ভিতরে আহমদীয়তের ছাপ লেগে গেলে। ভাবলাম আমার আহমদী হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মধ্যে সেই সৎ সাহস ছিল না যে, আমি বয়াত করব এবং ঘোষণা করব, আমি আহমদী। কেননা, বিয়ে-সাদী হয়ে গিয়েছিল, সন্তানাদিও ছিল। পরিবারের অন্যান্য লোকও ছিল। এভাবেই কেটে গেল সময়। এলো ১৯৭৪ সাল। আহমদীদের বিরুদ্ধে খুব হৈ চৈ লুটপাট চলছিল। ঔষধ, চশমা ইত্যাদির দোকান লুটপাট চলছিল। তখন আমি ভাবলাম, এখন তো পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ্তাআলার দিকে ঝুঁকে যাওয়া দরকার। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা দরকার। আমি ১৯৭৪ সালের কথা বলছিলাম, কিন্তু তার আগে আমি ১৯৬৮ সালে একটু ফেরত আসতে চাই। ১৯৬৮ সালের ঘটনা- যেভাবে একজন বোকা লোক জেদ করে সেভাবে আমার মনের মধ্যে এ খেয়াল চাপল যে, আমার স্ত্রী হাসাপাতালে আছে সন্তান হওয়ার মত হয়েছে। আমি আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞেস করি, হে খোদা তুমি আমাকে বল কী হবে। যদি তা-ই হয় তবে আমি আহমদীয়ত গ্রহণ করব। বোকামী ছিল। আল্লাহ্র সঙ্গে এমন ধরনের জেদ করা উচিত নয়। যা হোক আমি দোয়া করেছি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় দিন আমি স্বপ্নে দেখলাম একটা-পুল যার এক দিক থেকে আমি যাচ্ছি আর অপর দিক থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আসছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এক হাতে মইষের দড়ি ধরে আছেন আর একহাতে একটি শিশু সন্তান ধরে আছেন। তিনি পুল পেরিয়ে এসে দড়ি আমার হাতে হাতে ধরিয়ে দিলেন। বাচ্চাকেও আমাকে দিয়ে দিলেন। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। সাতদিন পর আমার শ্বশুর সাহেব সিয়ালকোটের হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। আমার স্বপ্ন সত্য হ'ল কি না এটা দেখার জন্য আমার মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল। এদিকে লজ্জাও ছিল আবার বড়দের সম্মানেরও ব্যাপার আছে, আমি শুধু দূর থেকে এতটুকুই জিজ্ঞেস করলাম- 'খবর সব ভালো তো'?

তিনি বললেন, - মিষ্টি নিয়ে এসো, তোমার ছেলে হয়েছে। সামান্য একটা ব্যাপার কিন্তু আমার জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল। বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'ল। এভাবে দিন যেতে থাকলো। যখন আমি রাবওয়া যেতাম ঈমান এক রকম হ'ত- আবার রাবওয়া থেকে যখন বেরিয়ে আসতাম তখন ঈমান অন্য রকম হয়ে যেত। বারবার খোদাকে বলতাম- হে খোদা! আমাকে একদম পরিষ্কার করে বল। তারপর এমন একটা সময় এলো যখন আল্লাহ্তাআলা আমাকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দিলেন। আমি স্বপ্নে দেখলাম - মসজিদে নববীতে হযরত রসূলে করীম (সঃ) বসে আছেন। সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বসে আছেন, সাহাবা (রাঃ) আছেন, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বসে আছেন। এছাড়া সমস্ত ইমাম (রহঃ) বসে আছেন।" এর চাইতে বড় কথা আর কী হতে পারে। যাহোক এরপর ১৯৭৪ এলো। খুব হৈ চৈ হলো। একদিন আমি বাজারে গিয়ে (আহমদীদের উপর) অত্যাচার দেখলাম। সেদিন আমি প্রথমবারের মত বাজারে দাঁড়িয়ে খুব কেঁদেছি। সেদিন আমি বুঝেছি এসব সত্যবাদীদের সঙ্গে হয় মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে নয়। সেখান থেকে আমি সোজা মসজিদের দিকে এসেছি। দরজা বন্ধ ছিল। সেদিন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি আর আমার অপেক্ষা করা চলে না। আমাকে এবার বয়াত করে নেয়া উচিত। পরবর্তী দিন আমি বয়াত গ্রহণ করলাম। ঐ

সময় অবস্থা এ ছিল যে, এদিকে আমি তো বয়াত করেছি কিন্তু আমার স্ত্রী ও তিন মেয়ে ও এক ছেলে এই ৪ (চার) সন্তানের কাউকেই কিছু বলি নি। এরপর আমি আল্লাহ্‌র কাছে খুব দোয়া করেছি যে, আল্লাহ্ রহম কর। আমার ঘরের অবস্থা আমার অনুকূলে করে দাও। আমার চিন্তাধারার দিকে তাদের চিন্তাধারাও ঘুরিয়ে দাও। তাদের প্রতি ওহী কর অথবা একটা কিছু কর। যা হোক ১৯৭৪ সালে যখন ঘোড় সওয়ার পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে নিরাপত্তা দিয়ে রাবওয়ায় জলসা হ'ল তখন আমি আমার পরিবার সমেত সেখানে হাজির হলাম। তারপর ১৯৭৫ সালেও নিয়ে গেলাম। ১৯৭৫ সালে আমার স্ত্রী নিজেই আমাকে বলল, 'আমি আহমদী হয়ে যাচ্ছি'। জোর-জবরদস্তি ছিল না। সে বলল- 'যদি ইমাম মাহদীকে মানলে কাফির হয়ে যেতে হয় তবে ঠিক আছে আমি কাফির হতে রাজি আছি। পরে যদি আরও ইমাম মাহ্‌দী আসে আমি মানব। আগে এ ইমাম মাহ্‌দীকে তো মেনে নিই।'

এরপর আল্লাহ্‌র ফযল হ'ল আমার ঘরে। শান্তি ফিরে এল। আমার বাকি পরিবারের লোক-ভাই বোন সবাই আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কেউ আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। বিয়ে-সাদির কিছু কথা-বার্তা হয়েছিল তা-ও ভেঙ্গে গেল। এভাবে দিন চলে গেছে। এখন অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে দু' মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আহমদী ছেলের সঙ্গে। আর দুই সন্তানের মধ্যে এক ছেলে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে আর এক মেয়ে কলেজের ৪র্থ বর্ষে পড়ছে। আল্লাহ্‌তাআলার অফুরন্ত করুণা হয়েছে আমার উপর।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার ছেলে আহমদী হয়েছে কি?

**প্রশ্ন ঃ উত্তর ঃ** হ্যাঁ, আমার ছেলেও আহমদী। এবং তার একটি আহমদী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

**প্রশ্ন ঃ** আপনার পিতা-মাতার কথা কিছু বলুন।

**উত্তর ঃ** আমার পিতা তো ১৯৪৪ সালে মারা গিয়েছিলেন। মা ছিলেন, তিনিও ১৯৭৫ সালে গত হয়েছেন। এখানেও একটা ঘটনা আছে। যখন আমার মা মারা গেলেন এবং তাকে জানাযার জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল, আমিও সাথে ছিলাম। সবাই ভাবল, আমার যেহেতু মা আমি হয়তো জানাযা পড়ব। গুজরাঁওয়ালায় মারা গিয়েছিলেন, ওখানকার জামাতে আহমদীয়ার আমীর আব্দুর রহমান সাহেব আমার ঘরে সমবেদনা জানাতে এলেন। কিন্তু তিনি জানাযার সময় সেখান থেকে সরে গেলেন সম্ভবতঃ এ ভেবে যে, এতো এখন জানাযা পড়বে কিন্তু আমাকে দেখে হয়তো দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু মা মায়ের জায়গায় আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হুকুম নিজের জায়গায়। যখন জানাযার নামায শুরু হ'ল, আমি শামিল হলাম না। কবর খোড়া হচ্ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভাই ছিল, যখন আমি দাফন সেরে ঘরে ফিরে এক পা রেখেছি এমনি সবাই আমার উপর ক্ষেপে উঠল। সবাই বলল, এখন তোমার সাথে আমাদের আর চলবে না। যে মা তোমাকে জন্ম দিল, তোমাকে লালন-পালন করল তুমি তার জানাযা পড় নি। সুতরাং তুমি এর পর আর ঘরে আসতে পারবে না। তারপর আমি আর কখনও যাই নি। এ হ'ল আমার পিতা-মাতার ঘটনা।

**প্রশ্ন ঃ** নানার সঙ্গে আপনার কখনও দেখা হয়েছিল?

**উত্তর ঃ** না কখনও হয় নি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নানী মাঝে মধ্যে আসতেন জমির ফসল নেয়ার জন্যে। মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর চার স্ত্রী ছিল। সবচাইতে ছোটজন সৈয়্যদ বংশের ছিলেন।

**প্রশ্ন ঃ** শুনেছি আপনার মা তার বাবা অর্থাৎ মৌঃ মোঃ হোসেন বাটালবী সাহেবকে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার জবাবে তিনি যা বলেছিলেন তা একটু বলুন।

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, ব্যাপারটা ছিল এ রকম। আমি তো আহমদী হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার মা মৌঃ মোঃ হোসেন সাহেবের এক মেয়ে ছিল সাফিয়া, তার স্বামী মৌঃ আব্দুল জব্বার। আহলে হাদীস ফের্কার লোক। তিনি হাফেযাবাদের পাশে কলুতাড়ের নামক স্থানে থাকতেন। তাকে ডেকে এনে আমার সঙ্গে বাহাস করাতেন। কিন্তু যে একবার আহমদী হয়ে যায়, এসব মৌলভী দিয়ে সে কখনও জব্দ হতে পারে না। কেননা, এদের কথোপকথনের ধরন মূর্খতাপূর্ণ হয়, শিক্ষা-দীক্ষার কোন ছাপ থাকে না। যাহোক মৌলভী আব্দুল জব্বার সাহেবের সঙ্গে আমি তর্ক-বির্তক করছিলাম এমন সময় মা আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন- "এখনও মেনে নেও। নবী আমরা কখনও মানব না। আব্বাজী বলতেন- (নাউযুবিল্লাহ্) মির্যা যদি মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করত তবে আমি মেনে নিতাম।"

**প্রশ্ন ঃ** বাটালার কোন খবর আপনি বলতে পারেন?

**উত্তর ঃ** বছর দুই আগে যখন বন্ধুগণ কাদিয়ানে গিয়েছিলেন তখন আমি তাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম কিছু খোঁজ-খবর নিয়ে আসার জন্য। তারা দেখে এসে আমাকে বলেছেন, পুরীদের একটা মহল্লা ছিল বাটালায় সেখানে মৌলভী সাহেবের একটা মসজিদ ছিল। হানিফ ভাট সাহেব এবং তার সাথে এসেছিলেন কাশ্মীরের হাফেয আসলাম উদ্দিন সাহেব। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি নিজে গিয়ে দেখেছি যে, ঐ মসজিদের একটা অংশে মদের দোকান হয়েছে অপর অংশে খোলা জায়গা যেখানে গ্রাম থেকে লোকজন এসে তাদের সাইকেল রেখে শহরে কেনা-কাটা করে।

**প্রশ্ন ঃ** তার কবরের কোন অস্তিত্ব আছে কি?

**উত্তর ঃ** তার কবর একদম মিটে গেছে। তার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। জামাতিভাবেও খোঁজ-খবর করা হয়েছে কিন্তু কোথাও কোন খবর পাওয়া যায় নি।

**প্রশ্ন ঃ** মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের যারা মান্যকারী বা সঙ্গী সাথী ছিলেন তারা কেউ আপনাদের সাথে পরে কোন যোগাযোগ করেছিল কি?

**উত্তর ঃ** হ্যাঁ, মৌলানা আব্দুল্লাহ্ সানী ছিলেন, এরা তো খোদার সাথেই যোগাযোগ রাখে নি, আমাদের সাথে কি যোগাযোগ রাখবে।

**- এন, এ, শামীম আহমদ, বেলজিয়াম**

# হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা

(৪র্থ কিস্তি)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বনী ইসরাঈলের সাথে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মিলের কথাই এ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে- যেভাবে দু'পায়ের জুতা মিলে যায়। আজ পত্রিকা খুললেই চোখে পড়বে বিভিন্ন অপকর্মের কথা বা ঘটনা। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হয়ে কি এ ধরনের কাজ কোন মুসলমানের লক্ষণ? আর ফিরকার কথা বলতে গেলে- আজ দেখা যায় ফিরকা, উপ-ফিরকা মিলিয়ে দু'শত ছাড়িয়ে গেছে। নিম্নে শুধুমাত্র ১০০টি ফিরকার নাম লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

১। ইসমাইলীয়া
২। শুরুন বুলালিয়া
৩। রওশানিয়া
৪। মালামাতিয়া
৫। তাইবিয়া
৬। হাশিমিয়া
৭। চিশ্‌তিয়া
৮। কাদেরিয়া
৯। নাকশেবন্দিয়া
১০। হায়দারিয়া
১১। মাদানিয়া
১২। আহলে কুরআন জায়দীয়া
১৩। আহলে হাদীস
১৪। পুস্তনিশিয়া
১৫। নবুবিয়া
১৬। কুনিয়াবিয়া
১৭। সিন্নাবিয়া
১৮। আবাহিয়া
১৯। ইরনাদিয়া
২০। সুরাদিয়া
২১। হাম্মুদিয়া
২২। সোরোবর্দিয়া
২৩। সোলায়মানী
২৪। কুশাইরিয়া
২৫। আজজু জিয়া
২৬। বাক্কাইয়া
২৭। সিদিয়া
২৮। খালওয়াতিয়া
২৯। বাইউশিয়া
৩০। কায়সানিয়া
৩১। হাফনাবিয়া
৩২। তাছলিয়ানিয়া
৩৩। হাতেমিয়া
৩৪। তিজানী
৩৫। ফেরদৌসিয়া
৩৬। মারাজিকা
৩৭। কারসানী
৩৮। হামজাবিয়া
৩৯। নূর বক্‌সীয়া
৪০। শাফেয়ী
৪১। হাম্বলী
৪২। ওহাবী
৪৩। হানাফী
৪৪। মালেকী
৪৫। রিজভী
৪৬। ইসনে আশারা
৪৭। তাববাইয়া
৪৮। বি-বারীয়া
৪৯। ফানাইয়া
৫০। হামাদিশা
৫১। ইবাদি
৫২। হিম্মাতিয়া
৫৩। মজাদ্দেদিয়া
৫৪। ফরাইজিয়া
৫৫। খামুছিয়া
৫৬। নিমাতাল্লাহিয়া
৫৭। ছিদ্দিকিয়া
৫৮। আল্লাবিয়া
৫৯। আয়দারুসিয়া
৬০। শায়খিয়া
৬১। তাছিকবিয়া
৬২। জাবুলিয়া
৬৩। পীর হাজাত
৬৪। উলউয়ানিয়া
৬৫। দারকাওয়া
৬৬। আউ আমেবিয়া
৬৭। ছাল্লামিয়া
৬৮। খারেজী
৬৯। তালিমিয়া
৭০। জালওয়াতিয়া
৭১। গুরুজমার
৭২। বুন্দারিয়া
৭৩। আদাহ্‌মিয়া
৭৪। জুনাদিয়া
৭৫। ইউনুছিয়া
৭৬। ছাত্তারিয়া
৭৭। দাউদী
৭৮। হাকিমিয়া
৭৯। হুলমানিয়া
৮০। গাজিয়া
৮১। শাজিলিয়া
৮২। ফাদালিয়া
৮৩। বাবাইয়া
৮৪। আকবারিয়া
৮৫। মানাইফিয়া
৮৬। আনবাবীয়া
৮৭। কুবরা বিয়া
৮৮। কানাছিয়া
৮৯। বায়কামিয়া
৯০। মুহাছিবিয়া
৯১। মাওলবীয়া
৯২। মুরজি
৯৩। দুরুজ
৯৪। গাউছিয়া
৯৫। কতুবিয়া
৯৬। গাজ্জালিয়া
৯৭। জাররাহিয়া
৯৮। নুছায়িরি
৯৯। বুনুহিয়া
১০০। মাইজভান্ডারী।

ইত্যকার ফিরকাগুলো ছাড়াও বিভিন্ন রশির নাম শুনতে পাই। আবার হিন্দুদের মত কীর্তন করে এমন মুসলমানেরও অভাব নেই। এখন যে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে তাহলো হাদীসে বর্ণিত নাজাতপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে জানতে হবে মহানবী ও মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল অথবা তাদের কার্যকলাপ ও আচরণ কোন্ ফিরকার সাথে মিলে? আমরা সবাই এ বিষয়ে নিশ্চিত এবং জানি যে, মহানবী ও তাঁর সাহাবারা খোদার জন্য পাথরের ঢিল খেয়েছেন। তাঁরা খোদার খ্যাতিরে সমাজ ছেড়েছেন। তাঁরা কুরআনের খ্যাতিরে অপমান সয়েছেন এবং শহীদ হয়েছেন। এ যে কষ্ট, এ যে অপমান, বর্তমানে কোন্ দল তা সহ্য করছে! শুধুমাত্র এটুকু প্রশ্নের উত্তর বেরুলেই নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার নাম বের হবে। এ ধরনের কষ্ট, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত। আর এ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। এছাড়াও মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর যেসব ব্যবস্থাপনা ও খেলাফতে রাশেদার যুগে যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল তা এ জামাতের মধ্যেও রয়েছে। যেমন ঃ খেলাফত, মজলিসে শূরা, কেন্দ্র, বায়তুল মাল ইত্যাদি।

এখন আমরা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী নিয়ে আলোচনা করবো। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তাহ'ল একটি আসমানী নিদর্শন। এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আসমানী নিদর্শন থেকে বলার কারণ এই যে, এ নিদর্শন শুধুমাত্র খোদা-ই প্রদর্শিত করাতে পারেন। কেননা, কুরআনে বর্ণিত আছে- **"আশ্‌ শামসু ওয়াল কামারু বি হুসবান"** অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রের গতি স্বয়ং আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"নিশ্চয়ই আমার মাহ্‌দীর আগমনের এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয় নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং (সূর্যগ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে (দারকুতনী ঃ ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণাঙ্গীনভাবে পূর্ণ হয়েছে। এবং তা প্রমাণ করেছে যে, মির্যা গোলাম আহমদই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী। এ গ্রহণ ১৮৯৪ সনের অর্থাৎ ১৩১১ হিজরীর রমযান মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭:০০টা থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখ সকাল ৯.০০টা থেকে ১১.০০টা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ হয়। চাঁদের ১৩ এবং ঐ মাসেরই ২৮ তারিখ ছিল ২১শে মার্চ ও ৬ই এপ্রিল। অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩ তারিখ চন্দ্রগ্রহণের এবং ২৮ তারিখ সূর্যগ্রহণের নির্ধারিত তারিখদ্বয়ের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম ও মধ্যম তারিখ। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা যেমনঃ আজাদ, পাইওনিয়ার, সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট ইত্যাদিতে এ গ্রহণ সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়। পশ্চিম গোলার্ধের মানুষের জন্য এ গ্রহণ আবার ১৮৯৫ সনের ১১ই মার্চ (চন্দ্রগ্রহণ) ও ১৬শে মার্চ (সূর্যগ্রহণ) আমেরিকায় সংঘটিত হয়। এ অনন্যসাধারণ গ্রহণ যা দাবীকারকের উপস্থিতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে শুধুমাত্র একটিবার সংঘটিত হয়েছে (দ' গোলার্ধে দু'বার) তা লিপিবদ্ধ রয়েছে History of Eclips নামক পুস্তকে। এ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসটিকে নিয়ে অযথা সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়। অথচ ইমাম মাহ্‌দী হিসাবে মির্যা গোলাম আহমদ যখন দাবী করেন তখন এই গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন দাবীকারক ঐ সময়ে মজুদ ছিল না যে, এ দাবী করতে পারে, সে গ্রহণ তাঁর সমর্থনে প্রদর্শিত হয়েছে।

এছাড়াও ইমাম মাহ্দী আগমনের আরও লক্ষণাবলী রয়েছে। যেমন ঃ "ইমাম মাহ্দী (সঃ)-এর আগমনের লক্ষণ এই যে, তাঁহার আগমনের সময় পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র (ধুমকেতু) উদিত হবে এবং বার বার উদিত হবে (হুজাজুল কেরামা)।

উপরোক্ত নক্ষত্রও যথা সময়ে প্রদর্শিত হয়েছে। হ্যালীর ধূমকেতু জগদ্বাসীকে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দীর আগমন ঘটেছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস যাতে আখেরী যুগের আলামতের বিশদ বর্ণনা রয়েছে তা উদ্ধৃত করা হ'ল ঃ

"ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়্যত প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব হবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, দলের সর্দার ফাসেক হবে, জাতির নীচ লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, তাতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসব আলামত অনেক আগেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ এখনো একথা বলা যে, "উদ্ধারকারী আসে নি" এটা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যায়ে ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর বংশ, নাম ও জন্মস্থান সম্পর্কে আলোচনা করছি -

(১) বংশ ঃ ইমাম মাহ্দী ফাতেমার আওলাদ হবেন (কানযুল উম্মাল)।

তিনি সৈয়্যদ বংশীয় হবেন বলেও হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে।

(২) নাম ঃ ইমাম মাহদীর নাম আহমদ হবে। (হুজাজুল কেরামা ঃ ৩৫৬ পৃষ্ঠা)।

(৩) জন্মস্থান ঃ ইমাম মাহদী 'কারা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন (হুজাজুল কেরামা ঃ ৩৫৮ পৃষ্ঠা)।

মাহে নও চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে আছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের মিলিত স্থানের নাম 'কারা'। বর্তমান কাদিয়ান পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের মিলিত স্থান। কাদিয়ানকে 'কারা' নামেও ডাকা হ'ত।

যদিও এমন কোন সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে সাব্যস্ত নয় তথাপিও উলামারা বলে থাকেন হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামে তাঁর (আঃ) নাম এবং পিতামাতার নামে তাঁর (আঃ) পিতামাতার নাম হবে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত শব্দার্থ ছক দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

| নাম ও অর্থ | পিতার নাম ও অর্থ | মাতার নাম ও অর্থ |
|---|---|---|
| মুহাম্মদ/আহমদ | আব্দুল্লাহ বা খোদার দাস | আমেনা বা আলো |
| আহমদ | গোলাম বা খোদার দাস | চিরাগ বিবি বা আলো |

উল্লেখ্য, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের অপর নাম ছিল আহমদ। এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের পিতা মাতার নাম ছিল আরবীতে এবং ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর পিতা মাতার নাম ছিল উর্দূতে যার অর্থ এক ও অভিন্ন।

উপরোক্ত দলীলসমূহের ভিত্তিতে সন্দাহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একজন সত্য মুজাদ্দিদ ইমাম মাহ্দী, মসীহ্ মাওউদ ও উম্মতি নবী। সত্যের খ্যাতিরে এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লামের কথামত তাঁর (আঃ) উপর ঈমান আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

- এহসানুল হাবীব (জয়)

# হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সঠিক জন্ম তারিখ

আল্লাহ্তাআলার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চতুর্দশ হিজরীর গোড়াতেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পূর্ণ সম্পাদন করেছেন। তাঁর আগমনে ইসলাম স্বীয় সম্মান ও মর্যাদাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর পবিত্র হাতে দীক্ষা গ্রহণকারী কোটি কোটি আহমদী মুসলমান ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত করছে। তাঁর মাধ্যমে যে "কুদরতে সানীয়া" পৃথিবীতে প্রবর্তিত হয়েছে সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান ইমাম হযরত আকদস মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সূদূর প্রসারী দক্ষ ও কল্যাণময় নেতৃত্বে আজ সারা বিশ্বে আহমদীয়তের পতাকা উজ্জ্বল তারকার ন্যায় জ্বল জ্বল করছে। আজ জামাতের সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থাদি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের সব মানুষের সামনে ইসলামের সত্যতা উপস্থাপন করছে। দলিল-প্রমাণ যুক্তি ও সব ধরনের ব্যবস্থার প্রয়োগে জামাতের কাজকে করছে গতিশীল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে আজও আমাদের সঠিক তথ্য জানার আবশ্যক আছে। হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) যে দিন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেদিন কেউই জানতো না যে, এ ছেলেই একদিন পৃথিবীবাসীকে উদ্ধার ও জাগ্রত করবেন। আর সে যুগে জন্ম নিবন্ধীকরণের মত আধুনিক কোন ব্যবস্থাদিও ছিল না। তাই তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঠিক সময় জানার জন্যে জামাত গবেষণা করে প্রকৃত বিষয় সাধারণের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। আপনাদের সামনে ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সঠিক বয়স সম্বন্ধে একটি গবেষণা লব্ধ বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করি আপনারা এর দ্বারা উপকৃত হবেন ঃ

হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক মহান আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ "সামানীনা হাওলান আও কারীবান্ মিন যালিকা" (ইলহাম ঃ ১৮৬৫ খৃঃ তাযকিরা পৃঃ ৭) "অর্থাৎ তোমার বয়স আশি বছর কিংবা এর কাছাকাছি হবে"। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আঃ) নিজেই লিখেছেন, "এ প্রতিশ্রুতি সংশ্লিষ্ট ওহীর বাহ্যিক শব্দাবলী চুয়াত্তর (৭৪) আর ছিয়াশি (৮৬)-এর মাঝে আয়ু নির্ধারণ করছে (বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খন্ড, পরিশিষ্ট পৃঃ ৯৭, টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্য আরেক স্থানে একই প্রসঙ্গে হযরত আকদস (আঃ) লিখেছেন ঃ "আশি অথবা এর চেয়ে চার পাঁচ বেশি অথবা চার পাঁচ কম" (হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ৯৬)।

এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আকদস মাহ্দী (আঃ)-সাড়ে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

**আয়ু কীরূপে যাচাই করা হয়, আয়ূ যাচাই-এর পদ্ধতি কি?**

কারো আয়ূ যাচাই করতে হলে দু'টো বিষয় জানা আবশ্যক ঃ (১) তাঁর জন্ম তারিখ। (২) তাঁর মৃত্যুর দিন-ক্ষণ। হযরত আকদস ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মৃত্যুর তারিখ হলো ২৪শে রবিউস সানী ১৩২৬হিঃ কমরী মোতাবেক ২৬শে মে ১৯০৮ ইং সন। কিন্তু হুযূর (আইঃ)-এর জন্ম তারিখ তাঁর কোন গ্রন্থ বা পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই। কেননা, যে যুগে হযরত আকদস জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগে জন্ম তারিখ সংরক্ষণ বা জন্ম

পাক্ষিক আহমদী ♦৩১

নিবন্ধীকরণের কোন প্রচলন ছিল না। এ কারণেই কেবল অনুমানের ভিত্তিতে হুযূর (আঃ)-এর বয়স বিভিন্ন লেখায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেই বলেছেন ঃ "বয়সের সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কিন্তু আমার জানা মতে, এখন যে সময় অর্থাৎ ১৩২৩ হিজরী সন চলছে আমার বয়স হলো ৭০ বছরের কাছাকাছি বাকি আল্লাহ্ ভালো জানেন" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১৯৩ দ্রষ্টব্য) এতে বুঝা গেল, হুযূর আকদস (আঃ)-এর জন্ম তারিখ নির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত হয় নি।

এতদ্সত্বেও হুযূর (আঃ)-এর মুখনিঃসৃত এমন কিছু কথা ও আলামত বিদ্যমান আছে যদ্বারা পরিষ্কার ও সুষ্ঠুভাবে হুযূর (আঃ)-এর জন্ম তারিখ নিরূপণ করা সম্ভব। এ গণনা ও হিসাব অনুযায়ী হযরত আকদস ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জন্ম তারিখ ১৪ই শাওয়াল, ১২৫০ হিজরী, মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ইং শুক্রবার সাব্যস্ত হয়।

কোন্ হিসাব আর গণনা দ্বারা হযরত (আঃ)-এর জন্ম তারিখ অকাট্যভাবে নির্ধারণ করা হ'ল তা নিম্নরূপ ঃ

হুযূর (আঃ) বলেছেন ঃ "আজিষ বারোয জুমু'আহ্ চাঁন্দ চৌদবীও তারিখ মেদ পায়দা হুয়া হ্যায়।

অর্থাৎ ঃ এ অধম শুক্রবার দিন, চাঁদের চৌদ্দ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছে (তোহফায়ে গোলড়াবিয়া, পৃঃ ১১০ টীকা, ১ম সংস্করণ)। আরো বলেছেন ঃ মেরী পায়দায়েশ কা মাহিনাহ্ ফাগুন যা চাঁদ কী চৌদবীও তারীখ থী জুমআহ্ কা দিন থা আওর পিছলী রাত কা ওয়াক্ত থা। অর্থাৎ ঃ "আমার জন্ম মাস ছিল ফালগুণ, চাঁদের চৌদ্দ তারিখ ছিল। দিনটি ছিল শুক্রবার আর সময়টা ছিল রাতের শেষ প্রহর" (মুফতী মুহাম্মদ সাদেক (রাঃ) রচিত যিক্রে হাবীব, পৃঃ ২৩৮, ২৩৯)

উপরোল্লেখিত ভাষ্য দুটো থেকে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে হযরত আকদস (আঃ)-এর জন্ম তারিখ বের করা খুবই সহজ। কেননা, নিম্নে প্রদত্ত পঞ্জিকার হিসাব থেকে ফালগুণ মাসের শুক্রবার চাঁদের চৌদ্দ তারিখ বের করা মোটেও দুষ্কর নয়।

| ইং তারিখ | হিজরী কমরী | দিন | হিন্দী তারিখ | তথ্যের উৎস |
|---|---|---|---|---|
| ৪ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩১ | ২০ শাবান ১২৪৬ হিঃ | শুক্রবার | ৭ ফালগুন ১৮৮৮ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১০১ |
| ১৭ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩২ | ১৪ রমযান ১২৪৭ হিঃ | শুক্রবার | ১ ফালগুন ১৮৮৮ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১০৩ |
| ১৮ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৩ | ১৭ রমযান ১২৪৮ হিঃ | শুক্রবার | ৪ ফালগুন ১৮৮৯ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১০৫ |
| ২৮ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৪ | ১৮ শাওয়াল ১২৪৯ হিঃ | শুক্রবার | ৫ ফালগুন ১৮৯০ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১০৭ |
| ১৩ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৫ | ১৪ শাওয়াল ১২৫০ হিঃ | শুক্রবার | ১ ফালগুন ১৮৯১ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১০৯ |
| ২৫ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৬ | ১৭ শাওয়াল ১২৫১ হিঃ | শুক্রবার | ৩ ফালগুন ১৮৯২ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১১১ |
| ২৪ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৭ | ১৮ যিলকা'দা ১২৫২ হিঃ | শুক্রবার | ৪ ফালগুন ১৮৯৩ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১১৩ |
| ৯ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৮ | ২০ যিলকা'দা ১২৫৩ হিঃ | শুক্রবার | ৭ ফালগুন ১৮৯৪ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১১৫ |
| ১ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৩৯ | ১৫ যিলকা'দা ১২৫৪ হিঃ | শুক্রবার | ৩ ফালগুন ১৮৯৫ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১১৭ |
| ২১ ফ্রেব্রুয়ারী ১৮৪০ | ১৬ যিলহাজ্জ ১২৫৫ হিঃ | শুক্রবার | ৪ ফালগুন ১৮৯৬ বিক্রমী | ১২৫ বছরের পঞ্জিকা 'তাকওয়িমে উসরী' পৃঃ ১১৯ |

উপরোক্ত ছক অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ফালগুণ মাসে শুক্রবার দিন চাঁদের চৌদ্দ তারিখ কেবল দু'টি বছরে হয়েছে ঃ (১) ১৮৩২ইং সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ই রযমান, ১২৪৭ হিজরী অথবা (২) ১৮৩৫ইং সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ই শওয়াল, ১২৫০ হিজরী সন।

এখন প্রশ্ন হলো, এই দু'টি সম্ভাব্য বছরের মধ্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর জন্ম সন ও তারিখ কোন্টি? এর উত্তরও মহান আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর নিজ লেখার মধ্যেই সংরক্ষণ করেছেন।

হযরত আকদস ইমাম মাহ্দী (আঃ) লিখেছেন ঃ "এটা চমকপ্রদ একটি বিষয় আর আমি একে একটি নিদর্শন বলে মনে করি ঃ ঠিক ১২৯০ হিজরী সনে এ অধম খোদাতাআলার পক্ষ থেকে তাঁর সাথে কথপোকথন ও বাক্যালাপের সম্মান লাভ করেছিল" (হাকিকাতুল ওহী পৃঃ ১৯৯, ১ম সংস্করণ)।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

উপরোক্ত উদ্ধৃতি মূলে জানা গেল, ১২৯০ হিজরীতে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সর্বপ্রথম একাধারে ব্যাপকভাবে আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপ আরম্ভ করেন। ১২৯০ হিজরী সনে তাঁর বয়স কত ছিল তা জানতে পারলেই নিশ্চিতভাবে তাঁর জন্ম তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে হুযূর (আঃ) নিজেই বলেছেন ঃ "যখন বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হলো তখন খোদাতাআলা তাঁর ইলহাম ও বাক্য দ্বারা আমায় সম্মানীত করলেন" (তিরইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ৬৮, ১ম সংস্করণ)।

অন্য আরেক স্থলে পুনরায় পদ্যের পংক্তি আকারে বলেছেন

"থা বরস চালীস্ কা ম্যাঁয় ইস মুসাফির খানাহ্ মেঁ
জাব কেহ ম্যায় নে ওহীয়ে রব্বানী সে পায়া ইফতিখার"

অর্থাৎ "আমি এ মুসাফির খানায় (পৃথিবীতে) চল্লিশ বছর বয়সের ছিলাম যখন খোদার ওহী প্রাপ্তির সম্মানে আমি ভূষিত হলাম" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, পৃঃ ১০৫)।

হযরত আকদস (আঃ) রচিত এ কথা থেকে জানা গেল, তিনি যখন আল্লাহ্র সাথে ব্যাপক বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আর পূর্বের উদ্ধৃতিতে তিনি বলেছেন, খোদার সাথে আমার ১২৯০ হিজরীতে বাক্যালাপ হয়েছিল। তাহলে তাঁর জন্ম সনের হিসাব দাঁড়াবে এবার ১২৯০-৪০ = ১২৫০ হিজরী সন।

উপরোক্ত হিসাব অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ১৪ইং শওয়াল ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ইং সন শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেছেন। হুযূর (আঃ) এ ধরধাম ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্র সন্নিধানে চলে যান ২৪শে রবিউস্ সানী, ১৩২৬ হিজরী সনে। তাহলে তাঁর মোট আয়ুষ্কাল ছিল ১৩২৬-১২৫০=৭৬ বছর। আরো বিস্তারিত হিসাব করলে দেখা যায় তিনি ৭৫ বছর ৬ মাস ১০ দিন এ ধরাধামে জীবিত ছিলেন।

তিনি যে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত, আর গয়েবের সংবাদ লাভ করতেন তা তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যা ১৮৬৫ সনে তাঁর সাথে করা হয়েছিল এর পূর্ণতা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

সুধী পাঠক, এ হলো সংক্ষেপে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আয়ু সংক্রান্ত সঠিক হিসাব। এ রচনা যদি আপনাদের জ্ঞানের সমৃদ্ধির কারণ হয় তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

(তথ্যসূত্র ঃ জনাব আব্দুর রহমান খাদেম সাহেবের রচিত পকেট বুক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব)

**- আহমদ তারেক মুবাশ্বের**
মোয়াল্লেম

# স্বাগতম ঈদুল আযহিয়া

আর কয়েক দিনের মধ্যেই যিলহাজ্জের চাঁদটি পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে চিকণ কাস্তের ন্যায় বাঁকা হয়ে উদিত হবে। আর ঐ চাঁদের দশ তারিখে মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে ঈদুল আযহিয়ার আনন্দের বন্যা বয়ে যাওয়া শুরু করবে। ইতি মধ্যে কিছু কিছু লোক ঈদুল আযহিয়াকে স্বাগতম জানানোর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌তাআলা বছরে দু'টি উৎসব পালন করার সুযোগ দান করেছেন। যার একটি পবিত্র রমযান মাসের কঠোর সিয়াম সাধনার পরে শওয়ালের চাঁদের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। অপর উৎসবের নাম ঈদুল আযহিয়া। ঈদুল আযহিয়া শব্দদ্বয় আরবী। মুসলিম সম্প্রদায় যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে পরম ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ মহাসমারোহে পশু জবাইর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যে আনন্দ উৎসব করে থাকে উহাই ঈদুল আযহিয়া। ঈদুল আযহিয়ার অপর নাম কুরবানীর ঈদ। কুরবানীকে আরবী ভাষাতে 'উযহিয়্যা' বলা হয়। উযহিয়্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল যে পশু কুরবানীর দিন জবাই করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌তাআলার রেজামন্দি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে নির্দিষ্ট পশু জবাই করাকে কুরবানী বলা হয়। কুরবানীর তাৎপর্য হলো, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ও প্রিয়বস্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা। সুফীগণের মতে পশু কুরবানী একটি প্রতীক মাত্র। কুরবানীর সঠিক তাৎপর্য হলো, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বাধা প্রদানকারী পশুসুলভ আচরণ হৃদয় হতে চিরতরে বিতারিত করা। কুরবানীর সম্বন্ধ তাকওয়া, তাহারাত, ঈমান ও মুত্তাকীয়াতের সাথে। সূরাতুল হাজ্জ ৩৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "উহাদের মাংস এবং উহাদের রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।"

যিলহাজ্জের চাঁদ উঠার পূর্ব হতেই কুরবানীর পশু কিনা আরম্ভ হয়েছে। চাঁদ উঠার পর এর পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যাবে। অনেকেই টাকার জোরে ১ টাকার মাল ৫০ টাকায় ক্রয় করবেন, যাতে লোকে বেশি দামের জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। এ ধরনের বাহবা খোদাতাআলার নিকট মূল্যহীন। কেননা, খোদাতাআলা কুরবানীকৃত পশুর মূল্য মাংস আর রক্তের পরোয়া করেন না। তিনি কবুল করেন কুরবানীকারী ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা।

এ কুরবানীর নিয়ম পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের বিকাশের বহুপূর্ব হতেই চালু ছিল, যেমন সূরাতুল হাজ্জ ৩৫ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ "আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমরা তাদিগকে জীবনোপকরণ হিসাবে যেসব গবাদি পশু দিয়েছে, সেগুলোর উপর তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে"।

মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুরবানী বা ঈদুল আযহিয়া হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কুরবানীর অপূর্ব ঘটনারই স্মৃতিচিহ্ন।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ইব্রাহীম আর হযরত ইসমাঈল স্বীয় প্রভুর নির্দেশের প্রতি যে অসাধারণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন একে জীবন্ত রাখার জন্যও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এবং তাঁর উম্মতের প্রতি কুরবানীর বিধান জারী করেছেন। পবিত্র কুরআন করীমে সূরাতুল কাওসারে বর্ণিত হয়েছে ঃ "সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর এবং কুরবানী কর।"

ঈদুল আযহিয়ার দিন ও ঈদুল ফিতরের ন্যায় দু' রাকাআত নামায আদায় করতে হয়। ঈদের নামায সামাজিক নামায। ঈদের নামাযে সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা সানন্দে উপস্থিত হয়ে থাকে। একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময়ের এ এক অপূর্ব মিলন মেলা। এ মিলন মেলায় ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, আমীর-ফকীর, শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের কোন ভেদাভেদ থাকে না। মহান স্রষ্টার নিকট আত্ম-নিবেদনের পর একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের যে অনন্য সুযোগ লাভ করা যায়, এর একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ঈদের নামায। ঈদের দিনের পরিবেশ যদি সমস্ত বছর জিইয়ে রাখা যেত, তবে অবশ্যই দুনিয়াটা জান্নাতে পরিণত হতো।

পবিত্র ঈদের দিনের অগণিত ফযিলত রয়েছে। হাদীসসমূহে যেসব রাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার দোয়ার কুবলিয়তের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে দু' ঈদের রাত অন্যতম। ঈদের উৎসবের সময় কে কতো দামী এবং সুন্দর পোষাক পরিধান করলো বা কে কতো উন্নতমানের পানাহার করলো সেটা মোটেই বিচার্য বিষয় নয়। বরং বিচার্য বিষয় হচ্ছে, স্বীয় আত্মাকে কে কত বেশি পাপাচার হতে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে ত্যাগ স্বীকারে কে কতটা ধন্য হতে পেরেছে তা-ই। ঈদের নামাযের ফযিলত সম্বন্ধে হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ যারা ঈদের নামায আদায় করতে ঈদের ময়দানে জমায়েত হয়, তাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদিগকে জিজ্ঞেস করেন, যারা স্বেচ্ছায় দায়িত্ব পালন করে আজ এখানে সমেবেত হয়েছে, তাদের কী প্রতিদান প্রদান করা উচিত? ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর প্রদান করবেন, তাদের নেক কাজের সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক প্রদান করা প্রয়োজন। তখন আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় ইজ্জতের কসম করে বলেন, অবশ্যই তিনি তাদের দোয়া কবুল করবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা ঈদের নামায সমাপনকারী তাঁর নেক বান্দাদের সম্বন্ধে ঘোষণা প্রদান করেন, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" হুযূর (সঃ) আরো বলেছেন, ঈদের নামায সমাপনকারীগণ নিষ্পাপ শিশুর ন্যায় ঈদ-মাঠ হতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম)। ঈদের নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। ঈদ মুসলিম বিশ্বে ক্ষণস্থায়ী নয়, বাৎসরিক আনন্দের বার্তা নিয়ে আগমন করে। আগমন করে সীমাহীন প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও কল্যাণের সওগাত নিয়ে। এ ঈদকে যথার্থ মর্যাদায় পালন করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

ঈদের নামাযে মহিলাদের হাজির হওয়া বা নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী। হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলে করীম (সঃ) মহিলাদেরকে ঈদের নামাযে যেতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় হুযূর (সঃ)-কে হায়েযগ্রস্থ মহিলাদের সম্বন্ধে ফয়সালা দিতে বললে, তিনি বলেন, ওয়াজ - নসীহত ও দোয়াতে তাদের হাজির হওয়া উচিত. এ সময় অপর এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, হে রসূলুল্লাহ্! যদি শরীর ঢেকে ঈদগাহে যাবার মত কারো কাপড় না থাকে?

হুযূর পাক (সঃ) বললেন, তবে তার সাথী কোন মহিলার কাপড় জড়িয়ে যাবে" (আবূ দাউদ, ২য় খন্ড)।

**ঈদ ফান্ড ঃ** ঈদের নামাযে আগত মুসল্লীদের নিকট হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কমপক্ষে এক টাকা করে ঈদ ফান্ড আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। এ টাকা ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করা হয়। বর্তমান জামানাতে আমরা যারা ঈদের নামাযে হাজির হই, ঈদ ফান্ড যখন প্রদান করি তখন যেন শত বছর পূর্বের এক টাকার মানের বিষয়টি যেন খেয়াল রাখি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) ঈদের দিনে নামায শেষে খুতবা প্রদান করতেন। অতঃপর তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট যেয়ে দান-সদকা করতে বলতেন। তখন মহিলারা তাদের অলঙ্কারাদি দান করত (আবূ দাউদ, আহমদ)। ঈদের নামাযের তাকবীর সম্বন্ধে হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হুযূর (সঃ) ঈদের নামাযে প্রথম রাকাআতে সাত তকবীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ ওয়াক্ত তকবীর পাঠ করতেন। এ তকবীর ছিল নামাযের জন্য নির্ধারিত তকবীরের অতিরিক্ত (ইবনে মাজা)। ঈদুল আযহিয়ার নামাযের পর পরেই পশু কুরবানীর ব্যস্ততা থাকার কারণে যতটা সম্ভব সকাল সকাল নামায আদায় করা উত্তম।

কুরবানীর পশু নিজ হস্তে জবাই করা সুন্নত। যদি কেউ অপারগ হয় তবে অন্যের সাহায্যে জবাই করাতে দোষ নেই। কুরবানীর গোশ্ত বন্টন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বুখারী শরীফের ২১৬০ নম্বর হাদীসে, হযরত সালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক বৎসর রসূলে করীম (সঃ) ঘোষণা দিলেন, "যারা কুরবানী করেছে তাদের গৃহে যেন তিন দিনের পর কুরবানীর গোশ্ত না থাকে। পরবর্তী বৎসর সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এ বছরও কি কুরবানীর গোশ্তের জন্য গত বছরের ঘোষণা বিদ্যমান থাকবে? উত্তরে হুযূর (সঃ) বললেন, কুরবানীর গোশ্ত খাও, লোকদিগকে দাও এবং জমা করেও রাখতে পার। গত বছর লোকেরা অভাবে ছিল, তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা জমা না করে লোকদের সাহায্য কর।" কুরবানীর গোশ্ত বন্টন বা সংরক্ষণের বিষয়টি কুরবানীদাতার পরিপার্শ্বিক লোকজনের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তবে মনে রাখতে হবে, গরীবদের মাঝে গোশ্ত বন্টন না করে সংরক্ষণ করে রাখা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কুরবানী তখনই খোদার দরবারে গ্রহণযোগ্য তা অর্জন করবে। যখন আমরা নিজেরা আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানীর পশুর গোশতের ন্যায় টুকরো হয়ে আগুনে পুরানো কিমাতে পরিণত হতে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হয়।

**- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম**
মোয়াল্লেম

# কুরবানীর গুরুত্ব এবং ঈদ

মানব জাতির জন্য কুরবানীর গুরুত্ব এত বেশি যা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রকৃত কুরবানীর যে মহৎ উদ্দেশ্য তা আমরা অনেকেই হয়তো বা জানি না। অনেকে মনে করি, সামনে আসছে গোশ্ত খাওয়ার দিন বা টাকা খরচের দিন। এ সব যারা চিন্তা করে তারা কখনও এ কুরবানীর যে নেকী রয়েছে তার ভাগীদার হতে পারবে না।

এখনও আমরা যারা কুরবানীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নই তাদেরকে সামনে রেখে আমি পবিত্র কুরআন, হাদীস, যুগ-ইমাম এবং খলীফার কিছু উক্তি দ্বারা কুরবানীর গুরুত্ব ইসলামে কতটুকু তা বুঝাতে চেষ্টা করবো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "অতঃপর যখন সেই পুত্র তার সঙ্গে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হলো তখন সে বললো, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি সুতরাং তুমি চিন্তা কর তোমার কী অভিমত? সে বললো, হে আমার পিতা! যা তোমাকে আদেশ দেয়া হয় তা-ই কর। ইনশাআল্লাহ্ তুমি অবশ্যই আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবে। অতঃপর যখন তারা উভয়ই (আল্লাহ্র সমীপে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে জবাই করার জন্য কপালের ওপর উপুর করে শোয়ালো, তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই (যথাযথ) পূর্ণ করেছ, নিশ্চয় আমরা এরূপেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় ইহা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমরা এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে তাকে রক্ষা করলাম" (সুরাতুস্ সাফ্ফাত ঃ ১০৩-১০৮)। ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেয়ার ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য। হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে। আয়াতটি থেকে আরও বুঝা যায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেয়ার যে প্রচলন ছিল তা পশু কুরবানীতে বদলে দেয়া হলো। এখানে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা হলো হযরত ইসমাঈল (আঃ) কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজ প্রাণ কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আজও আমরা আল্লাহ্কে খুশি করার জন্য পশু কুরবানী করে থাকি আর এ কুরবানীর উদ্দেশ্য এটাই। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রাণও চান তা-ও যেন কুরবানী করতে পিছ পা না হই। রসূল করীম (সঃ) বলেন, "হে লোকসকল! (জেনে রাখ) প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক" (আবু দাউদ)। এখন কেউ যদি বলে, গত বৎসর তো কুরবানী দিলামই এবার না দিলে কি এমন ক্ষতি হবে, এসব কখনও কল্পনা করাও পাপ হবে। যাদেরকে খোদাতাআলা সামর্থ্য দিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই প্রতি বৎসর কুরবানী দিতে হবে এবং এ কুরবানী কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই। রসূল করীম (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করে নি সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে" (ইবনে মাজা)। তা হলে চিন্তা করে দেখুন কুরবানী দেয়ার কত গুরুত্ব। যেখানে রসূল করীম (সঃ) বলছেন, কুরবানীর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কুরবানী না দেয় তাহলে ঈদগাহেই যেন না যায় অর্থাৎ ঈদের নামায পড়ারই কোন অধিকার নেই। আমরা যে পশু

কুরবাণী করবো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা কিন্তু হতে হবে সুস্থ। কোন প্রকার ত্রুটিপূর্ণ হলে চলবে না। যেমন রসূল করীম (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন, "আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন ওরূপ পশু দ্বারা কুরবানী না করি। যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গিয়েছে অথবা যার কান গোলাকারে ছিদ্র করা হয়েছে তা এবং যার কান পিছনের দিকে কেটে গিয়েছে" (তিরমিযী - আবূ দাউদ)।

রসূল করীম (সঃ) নিষেধ করেছেন, "আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি" (ইবনে মাজা)। আমরা যদি কেউ মনে করি যে, পশু কুরবানী দিব এতে আবার ভাল দেখে কিনার কি দরকার, যত ভাল দেখবো তত টাকাও তো বেশি লাগবে, একটা কিনে নিলেই হবে। এমন যারা করবে তাদের কুরবানী খোদা গ্রহণ করবেন না। কারণ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজ জীবনও কুরবান দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত আর সামান্য কিছু টাকার জন্য ভাল পশু কুরবানী দিতে প্রস্তুত হবো না কেন? আমরা যে খোদার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করি এতে খোদাতাআলা অনেক অনেক নেকী রেখেছেন। এ হাদীসটি পাঠ করলেই তা বুঝতে পারবো। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ কুরবানী কী? হুযূর (সঃ) উত্তরে বলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত (রীতি)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী (সওয়াব) আছে হে আল্লাহ্‌র রসূল? হুযূর (সঃ) বলেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কী হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশি)। হুযূর (সঃ) বল্‌লেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে" (ইবনে মাজা)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরবানীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, "যেহেতু এ মাসকে কুরবানীর মাস বলে, রসূলে করীম (সঃ) প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেভাবে আপনারা ছাগল, উট, গরু, দুম্বা জবাই করে থাকেন। সেভাবেই ঐ বিগত যুগে আজ থেকে ১৩০০ বছর পূর্বে (বর্তমান প্রায় ১৫০০ বছর) খোদাতাআলার পথে মানুষেরা (সাহাবাগণ) উৎসর্গীত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আযহিয়া তা-ই ছিলো আর এর মধ্যেই মধ্য গগনে সূর্যের আলো দিপ্তীমান ছিলো। এসব কুরবানী উহার শাখ নয় খোসা, আত্মা নয় দেহ। এ সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশের যুগে হাসি-খুশির ঈদ পালিত হয়ে থাকে। আর ঈদের পরিণতি হাসি-খুশি ও নানা ধরনের খাবার দাবারের আয়োজন করাকে ধরে নিয়ে থাকে। মহিলারা এ দিনে সকল প্রকার অলংকার পরিধান করে। ভাল কাপড়ে সুসজ্জিত হয়। পুরুষেরা ভাল ভাল পোষাক পরিধান করে থাকে। আর উত্তম খাদ্য একত্রে পরিবেশন করা হয়। এবং একে এমন আনন্দ ও খুশীর দিন মনে করে যে, কৃপণ থেকে অধিকতর কৃপণ লোকও আজ মাংস খেয়ে থাকে। বিশেষ করে কাশ্মীরীদের পেট তো ছাগল-বকরী দ্বারা বোঝাই হয়ে যায়। অন্যান্য লোকেরাও আসলে পিছনে পড়ে থাকে না। মোট কথা, প্রত্যেক ধরনের খেলা-ধূলা-হাসি-তামাশার নাম ঈদ মনে করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে এ দিনের গভীর রহস্য এ ছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে কুরবানীর বীজ বপন করে দিয়েছিলেন এবং গোপনভাবে বপন করেছিলেন আঁ হযরত (সঃ) এর বায়ু হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে খোদাতাআলার আদেশে জবাই করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি। এতে গুপ্তভাবে এ ইঙ্গিত ছিলো যেন, মানুষ দেহ-মনে খোদার হয়ে যায়। আর খোদার আদেশের সম্মুখে সে তার প্রাণ, নিজের সন্তান-সন্ততি ও তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের রক্তও তুচ্ছ মনে করে। রসূলে করীম (সঃ)-এর যুগে তিনি এখন এক পরিপূর্ণ পথ নির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে, কতই বেশি কুরবানী দেয়া হয়েছে। রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতাগণ নিজ পুত্রদের, পুত্রগণ নিজেদের পিতাদেরকে হত্যা করেছেন। এতে তাঁরা আনন্দ পেতেন যে, ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও তাদের আনন্দ হতো। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখো যে, হাসি-খুশী ও খেলা তামাশা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিকতার কোন অংশ অবশিষ্ট আছে কী? এ ঈদুল আযহিয়া পূর্বের ঈদ থেকে শ্রেয় এবং সাধারণ লোকও একে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বলো যে, ঈদের কারণে কত লোক আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি কতটা দৃষ্টি প্রদান করে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে অংশ লাভ করে? রমযানের ঈদ আসলে একটি সাধনার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম বজলুর রূহ (আত্মাকে বিক্রী করা) কিন্তু এ ঈদ, যাকে বড় ঈদ বলা হয়। এর মধ্যে এক মহান সাফল্য নিহিত আছে এবং দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় নি।

খোদাতাআলা, যাঁর দয়ার গুণ কয়েকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সঃ)-এর ওপরে খুবই উন্নতমানের এক করুণা দেখিয়েছেন যেন পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়াবলী ভালবাসা বা প্রাথমিক পর্যায়ের রঙ্গে ছিলো। উহার মাহাত্ম্য এ উম্মতে মরহুমা বা করুণা লাভকারী উম্মতের মধ্য সে দেখিয়েছে। সূরা ফাতিহার মধ্যে খোদাতাআলার এই যে ৪টি গুণ বর্ণিত হয়েছে যেমন- রব্বুল আলামীন (বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক) রহমান (পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী) রহীম (বার বার কৃপাকারী), মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (বিচার দিনের মালিক)। যদিও সাধারণভাবে এসব গুণ এ বিশ্বের ওপরে জ্যোতির্বিকাশ ঘটায় কিন্তু ওগুলোর মধ্যে আসলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। লোকেরা এর ওপরে কমই দৃষ্টি দেয়" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩)।

তাই আসুন আমরা বেশি বেশি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করি এবং গরীব-দুঃখীকেও সাথে রাখি আর এ ঈদকে শুধু আনন্দ উৎসবের দিন মনে না করে প্রকৃত ঈদে পরিণত করতে চেষ্টা করি তা হলেই খোদার সন্তুষ্টি লাভের আশা করা যাবে। হে খোদা মোদের এ কুরবানী তুমি গ্রহণ কর এবং সকলকে প্রকৃত উদ্দেশ্যে যা কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করছি তুমি আমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করো, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

# আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব

আল্লাহ্‌তাআলা স্বনির্ভর, সকলের নির্ভরস্থল, আমরা সকলেই তাঁর উপর সকল দিক থেকে নির্ভরশীল। তিনি রাজাধিরাজ। তবে কেন তিনি এ নির্ভরশীল মানুষের কাছে টাকা কর্জ চাচ্ছেন? মানুষ যদি তাঁকে কর্জ দেয় তবে কি তাঁর লাভ হবে নাকি মানুষেরই লাভ হবে? এ সব প্রশ্নের উত্তর ও আল্লাহ্‌তাআলার পরিকল্পনা যুগের খলীফার আহ্বান প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে।

মানুষের জীবন বিধান আল্ কুরআনের সূরা তওবার ১০৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে-

"তাদের ধন-সম্পদ হতে তুমি সদকা গ্রহণ কর। যেন এ দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার। এবং তাদের জন্য তুমি দোয়া কর। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"

এ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে একটি নির্দেশ দান করেছেন যে, তুমি লোকদের নিকট হতে সদকা গ্রহণ কর। এ সদকা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। আর সদকা শব্দটির সাথে সমাজের সাধারণ মানুষও পরিচিত। লোকেরা জানে সদকা দিলে বালা-মুসিবত দূর হয় রোগ-শোক ভাল হয়ে যায় অযথা পেরে শানি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। সদকার মধ্যে মালী কুরবানী নিহিত। আমরা জানি কোন আদেশ জনতাকে দেয়া আর নবী রসূলগণকে দেয়ার মধ্যে গুরুত্বই আলাদা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আদেশ দিয়েছেন- তুমি লও, গ্রহণ কর। মিন আমওয়ালিহিম তাদের ধন সম্পদ হতে **সাদাকাতিন** চাঁদা (অনেক মোফাসসির এর অর্থ করেছেন জোর করে আদায় কর) চাঁদা গ্রহণ করার এত গুরুত্ব কেন দিয়েছেন আল্লাহ? চাঁদা দিলে চাঁদা দাতার কী ফায়দা হবে?

এ সব প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্‌ই বলে দিয়েছেন। প্রধানতঃ ২টি কারণে ১। তাদেরকে পবিত্র করার জন্য। ২। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। এরপর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর আর তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক। অতএব বুঝা গেল আমরা আমাদের উপার্জিত টাকা হতে চাঁদা দিলে আমাদের অর্জিত টাকা পবিত্র হবে। পবিত্র জিনিস সজীব হয় আর সজীব জিনিস বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি চাঁদা দাঁতার অন্তরও পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ হতে থাকে।

মালী কুরবানীর সাথে তওবার সম্পর্ক আছে ঃ সূরা তওবার ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন- "তারা কি অবগত নয় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই আছেন যিনি তাঁর বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং সদকাহ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্‌ই আছেন যিনি সদয় তওবা গ্রহণকারী। বার বার কৃপাকারী।

**ব্যাখ্যা ঃ** আমাদের গুনাহ খাতা মাফির জন্য। তওবা কবুলের জন্য শর্ত হ'ল সদকা করতে হবে।

আমরা দেখছি মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা নামাযের পূর্বেও ঈদ ফান্ডে চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ খুশী আনন্দে, দুঃখ -দুর্দশায় সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় চাঁদা দিতে হয়।

হাদীসে আছে ঃ নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "আনফিকু ইয়া বাণী আদামা ইউনফিকু আলায়কা" অর্থ ঃ হে আদম সন্তান! খরচ কর, তাহলে তোমার প্রতিও খরচ করা হবে (বুখারী, মসুলিম)।

**কখন বা কোন সময় চাঁদা দিতে হবে?**

সূরা আল বাকারার ২৫৫ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন- "হে যারা ঈমান এনেছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে খরচ কর, সে দিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফয়াত বা সুপারিশ চলবে না, বস্তুত অস্বীকারকারীরাই যালেম।"

**ব্যাখ্যা ঃ** কোন্ মানুষের মৃত্যু কখন আসে কেউ জানে না? তাই যথা সময়ে নিজ নিজ চাঁদা আদায় করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চাঁদা দিলে গরীব হয়ে যাব। শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এটি বাস্তব। আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবার ঢাকার জলসায় প্রকাশ্যে বলেছেন ঃ যারা খাসভাবে চাঁদা আদায় করেছেন তারা আজ কেউ গরীব নেই। কে এমন আছেন যে চাঁদা দিয়ে গরীব হয়েছেন? এটি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন ধর্মীয় প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করবে আমি মনে করি না যে, সে যে অর্থ ব্যয় করবে তাতে তার সম্পদে কোন স্বল্পতা দেখা দিবে। বরং তার সম্পদে বরকত হবে। অতএব আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে খাঁটি অন্তঃকরণে পূর্ণ উদ্যমে বড় সাহসীকতার সাথে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে এ কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত। কারণ এটাই খেদমতের উপযুক্ত সময়। তারপর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন স্বর্ণের পাহাড়ও যদি এ পথে ব্যয় করা হয় তবুও আজকের এক পয়সার সমতুল্য হবে না।

তিনি (আঃ) আরও বলেন ঃ পৃথিবীতে কোন প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় জামাত চাঁদা ছাড়া চলতে পারে না। হযরত রসূল (সঃ) হযরত মূসা (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ) সকল নবীর যুগেই চাঁদা জমা করা হয়েছিল। অতএব আমাদের জামাতের লোকদের এদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি তারা যথারীতি নিয়মিত এক পয়সাও মাসে প্রদান করে তবে অনেক কিছু হতে পারে। "হ্যাঁ, কেউ যদি এক পয়সাও না দেয় তবে এমন লোকের জামাতে থাকার কি প্রয়োজন?" হুযূর (আইঃ) বলেন- নবাগতদের তরবিয়তের জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যে ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছে তাকে সাথে সাথে ধন-সম্পদ কুরবানী সম্বন্ধে তখনই বলে নিতে হবে। তার নাম রেজিষ্টারে লেখার সময় তাকে জিজ্ঞেস করে তখনই চাঁদার ওয়াদা লিখে নিতে হবে।

মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, অনেক নতুন আহমদী এমনও আছে যারা জানেই না যে, চাঁদা নেয়া হয়। এমন মানুষকে বুঝানো উচিত, যদি তোমরা সত্য-সত্যিই জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাও তবে আল্লাহ্‌র সাথে পাক্কা প্রতিজ্ঞা কর যে, কমপক্ষে এত পরিমাণ চাঁদা অবশ্যই নিয়মিত দিতে থাকব।"

"তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যদি তোমরা জ্ঞান রাখ (সাফ্ ঃ ১২)।

**ব্যাখ্যা ঃ** মুহাম্মদ (সঃ)-এর যুগে জীবন দিয়ে জেহাদ করা হ'ত পরে সম্পদের।

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর যুগে প্রথমে সম্পদের দ্বারা জেহাদ পরে জীবন দ্বারা। বর্তমান যুগে

ধর্মের নামে জেহাদের ডাক প্রায়ই শুনা যায়। পবিত্র কুরআনে এ আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত জেহাদ কেবল মাত্র আহমদীরাই করে থাকে তারা নিজ নিজ উপার্জিত অর্থ থেকে ১টি নির্দিষ্ট অংশ নেযামে বায়তুল মাল ফান্ডে প্রতি মাসে জমা দিয়ে প্রকৃত ইসলামী জেহাদে অংশ গ্রহণ করছে।

আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

"তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালবাস উহা হতে খরচ কর।"

**ব্যাখ্যা ঃ** এ যুগে মানুষের ভালবাসার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী তা কারও অজানা নেই। যদিও সন্তান-সন্ততি সবচেয়ে প্রিয় হবার কথা তবে বাস্তবে টাকাই সবচেয়ে প্রিয়। টাকার জন্য স্ত্রী সন্তানকেও বাদ দিতে মানুষ কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রবাদে আছে- "সন্তানের মৃত্যুর শোক ভুলা যায় কিন্তু টাকার শোক ভুলা যায় না"।

অর্থই অনর্থের মূল হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্‌তআলা এ অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রতি বার বার আদেশ প্রদান করেছেন। কুরআন করীমে এ অর্থের সুষম বন্টনের প্রতি প্রায় ২৫০ বার তাকিদ দিয়েছেন যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরল।

এ পর্যায়ে আমি ২/১টি ঘটনা আপনাদের শুনাব।

(১) আহমদীয়া জামাতের মুফতি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ৬৭তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিজের একটি কাশ্‌ফি হালতের ঘটনা শুনান। একবার তিনি কাশফি অবস্থায় দেখেন একজন আহমদী মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে আবার দুনিয়াতে এলেন। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হ'ল-আপনাকে আল্লাহ্‌তাআলা কী কী প্রশ্ন করেছেন? উত্তরে ঐ আহমদী বল্‌লেন- যারা আহমদী তাদেরকে অন্য কোন কিছু প্রশ্ন করা হয় না। শুধু ২টি প্রশ্ন ছাড়া ঃ প্রথম, তুমি ঠিকমত তবলীগ করেছ কিনা। দ্বিতীয়ত- তুমি ঠিক মত চাঁদা দিয়েছ কিনা?

২) স্বামীর বাজেটের চাঁদা পরিশোধের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভূমিকাও যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। (পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত)

নেযামে বায়তুল মালের পক্ষ থেকে বকেয়া চাঁদা পরিশোধের আশরা চলছে পাকিস্তানে - এক কমজোর আহমদীর ঠিকানা বের করে চাঁদা আদায়ের জন্য তার বাসা খোঁজাখুজি করে বহু চেষ্টায় বের করা হল। গৃহকর্তাকে জানান হ'ল তারা বকেয়া চাঁদার হিসাব নিয়ে এসেছেন। তখন গৃহকর্তা বললেন, আপনারা ভুল করে এ বাসায় এসেছেন। এটা কোন আহমদীর বাসা নয়। যা শুনে আদায়কারীগণ চলে এলেন। এদিকে গৃহকর্তা যখন ঘরে ঢুকতে গেলেন দেখেন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, কিয়া হুয়া? দরজা খোল। ভিতর থেকে তার স্ত্রী জবাব দিলেন- ইয়ে আহমদী কা ঘর হ্যা। স্ত্রী কিছুতেই দরজা খুলছে না। বেচারা তার ভুল বুঝতে পারলেন- তৎক্ষণাৎ খলীফা সাহেবকে টেলিফোন করে ঘটনা বলেন, এবং মাফ চাইলেন। চাঁদা দেয়ার অঙ্গীকার করলে পরে স্ত্রী তাকে দরজা খুলে দিলেন।

এতক্ষণ আমরা মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে শুনলাম। এবার কী ধরনের ধন-সম্পদ থেকে কুরবানী করতে হবে তা এখন জানবো। সূরা বাকারা ২৬৮নং আয়াত ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খরচ কর (চাঁদা দাও) পবিত্র বস্তু হতে। যা তোমরা উপার্জন কর এবং উহা হতেও যা আমরা তোমাদের জন্য জমীন হতে উৎপন্ন করি। আর তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তু হতে (চাঁদা দোয়ার জন্য) সংকল্প করো না যা হতে তোমরা খরচ কর বটে কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করে আদৌ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ ঐশর্যশালী সকল প্রশংসাময়।

**ব্যাখ্যা ঃ** এ আয়াতে চাকুরীজীবীদের বেতনের টাকা থেকে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার টাকা থেকে কৃষকদের জমীনের ফসলের আয় থেকে চাঁদা দিতে বলা হয়েছে। তবে হালাল রুজি থেকে। সুদ ঘুষের উপরি টাকা থেকে নয়।

**এখন আমরা জানব কী পরিমাণ ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতে হবে?**

আমরা যা বেতন পাই যা আমরা উপার্জন করি সবটাই কি দিয়ে দিতে হবে? না। "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়াছি তা থেকে কিছু অংশ খরচ কর।"

হাদীসে আছে - "তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর, যদি তা অর্ধাংশ খেজুরের টুকরো দিয়েও হয়।"

**ব্যাখ্যা ঃ** খেজুরের অর্ধাংশ আর কতটুকু! এতটুকু খরচ কর। এতটুকু খরচ করে হলেও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা পাও। একটি অর্থ ঃ যত গরীবই হোকনা কেন কিছু না কিছু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিতে হবে। (২) কোন কোন সময় সামান্য পরিমাণ চাঁদাও বা আল্লাহ্‌র নামে খরচও অনেক মূল্য বহন করে।

ক্ষেত্রে বিশেষে ১০০ টাকার চেয়ে প্রয়োজনে ১ টাকাও অনেক উপকার সাধন করে।

এসম্পর্কে এ যুগের ইমাম মাহ্‌দীও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি পেশ করে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব ঃ

"আমাদের জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি যে নাকি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে তার প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমি নিয়মিতভাবে এতটা চাঁদা দিতে থাকবো।"

চাঁদার হার হযরত খলীফা সানী (রাঃ) আয়ের $^{১}/_{১৬}$ অংশ লাযেমী চাঁদা আদায়ের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। আর এ চাঁদা স্বাচ্ছন্দ্যে পরিশোধ করা উচিত। যা দিতে হবে তা-ই দিচ্ছি সাগ্রহে নয় সেজন্য তারা নেকি কম পাবে।

তিনি আরো বলেন "হে আমার প্রিয়জনেরা! এটা ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্য সমূহের জন্য খেদমতের (কুরবানীর) সময়, এ সময়কে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ কর। এ সময় পুনরায় কখনও হাতে আসবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির সততা তার খেদমত দেখে যাচাই করা যায়।" যারা যাকাতের টাকা দেবার যোগ্যতা রাখেন, তারা যাকাতের টাকা এখানে পাঠাবেন। প্রত্যেক বাজে খরচ থেকে তারা যেন নিজেকে রক্ষা করেন এবং সেই অবশিষ্ট টাকা এখানে এ পথে ব্যয় করেন। যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন যেন সততা প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ্‌র ফযল (অনুগ্রহ) এবং রুহুল কুদুসের (পবিত্র আত্মার) পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কারণ এ পুরস্কার সে সকল লোকরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা এ জামাতে প্রবেশ করেছেন" - (কিশতিয়ে নূহ - রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খন্ড)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে নেযামে বায়তুল মাল ফান্ডে চাঁদা দিয়ে, মালীকুরবানী করে যুগের খলীফার পবিত্র হাতকে ইসলামী সেবায় শক্তিশালী করার জন্য অনেক অনেক বেশি তৌফীক দান করুন, আমীন।

- শাহ্ আলম খান

ধরণীর বুকে চলার পথে
দেখা এক ক্লান্ত পথিকের সাথে,
জানাই তাকে এ যুগের শান্তির দূত
মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন-বার্তা।
পথিক বলল আমায়,
অশান্ত এ পৃথিবীর বাতাসের মাঝে আজ বারুদের গন্ধ,
পরমাণু অস্ত্রের ঝংকার।
রক্তের নেশায় সমর সাজে ব্যস্ত
কিছু রক্ত-পিপাসু দানব-রূপী মানুষ;
এরই মাঝে সাধুদের হাহাকার, হায় একি হ'ল পৃথিবীর ঃ
সাধু হৃদয়ের আকুল আকুতি,
হে মানুষ!
উড়িয়ে দাও পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শুভ্র পতাকা
ছুঁড়ে ফেলে দাও সব মারণাস্ত্র
মহাকাশের অতল গহ্বরে
হাতে তুলে নাও একটি স্বচ্ছ সুন্দর ভালবাসা,
এ ভালবাসা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাও
লোভ-হিংসা আর ঘৃণার রাজ্যে
স্বার্থের দানবগুলোকে ধ্বংস করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দাও,
এক তিল ভালবাসা আমাকে দাও।
আমি তোমাদের ভালবাসবো এক তাল;
আমাদের যে ভালবাসবে এক কণা
আমরা তাদের ভালবাসবো দুই দুনিয়া ইহকাল-পরকাল।
হে মানুষ!
তখন আশ্চর্য দীপ্তিতে দেখবে তুমি
কোটি কোটি হৃদয়ের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছে একটি মাত্র শ্লোগান
Love for all hatred for none.
আর যদি তা না পারো
হে মানুষ!
আগুন তাঁতা সাড়াশি দিয়ে
চোখ দু'টি মোর উপ্‌ড়ে ফেল।
এ চোখ দিয়ে আমি আর দেখিতে চাই না
সৃষ্টির সেরা জীব দানবরূপী কিছু মানুষের হিংস্রতার ফসল,
কোটি মানুষের লাশ।
দেখিতে চাই না আমি

## কবিতা

## সাধু হৃদয়ের ব্যাকুলতা

পৃথিবীর আকাশের নীচে
নির্মম মানবিক মৃত্যুর শীতল স্তব্ধতা,
স্বজন হারা কোটি মানুষের চোখের
বাষ্প কণার মতো কুয়াশা।
আমি তো দেখিয়াছি এ ধরণীর বুকে
অসংখ্য মানুষের লাশের পাশে কুকুর শকুনের উল্লাস।
হে মানুষ!
উত্তপ্ত গলিত সীসা দিয়ে
কান দু'টি মোর স্তব্ধ করে দাও।
এ কান দিয়ে আমি আর শুনিতে চাই না
সৃষ্টির সেরা জীব রক্তপিপাসু দানবরূপী
কিছু মানুষের চীৎকার।
শুনিতে চাই না মারণাস্ত্রের ঝংকার,
দিগন্তের হাওয়ায় ভেসে আসা কোটি মানুষের হাহাকার।
আমি তো শুনিয়াছি
ভাই হারানো বোনের আর্ত চীৎকার
সমুদ্রের আকুল ঢেউয়ের মতো,
সন্তান হারানো মায়ের দিকে দিকে প্লাবিত কান্না।
হে মানুষ!
ধারালো ছুরির হিংস্রতায়
ফালি ফালি করে যেমনি কেটে ফেল
তাজা, লাল টকটকে একটি আপেল,
তেমনি করে তোমরা
কুটি কুটি করে ফেলো মোর হৃৎপিন্ড,
যে হৃৎপিন্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে
স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি গাঢ় ভালবাসা,
যে হৃদয় অমর শান্তি চেয়েছিল
আকাশের নীচে এ ধরণীর বুকে।
পেয়েছে শুধু হিংস্রতা, বীভৎসতা
আর পৈশাচিক রক্ত নেশার উল্লাস;
আমি আর সইতে পারছি না,
নিশ্চিহ্ন করে দাও তোমরা মোর অস্তিত্ব
এ ধরণীর বুক হতে
চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও
নিশ্চিহ্ন করে দাও।
আমি বললাম,
হে পথিক! পথহারা ক্লান্ত তুমি
এম.টি.এ (১) দেখবে এসো,
এম.টি.এ (২) তোমায় নিয়ে যাবে
মুক্তির মোহণীয়।

- নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম

টীকা (১) মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া
(২) মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গত ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৩ ইং রোজ শনিবার ঢাকার কতিপয় দৈনিক সংবাদপত্রে মানিকগঞ্জে 'কাদিয়ানী সম্প্রদায় ও গ্রামবাসী মুসল্লিদের সংঘর্ষ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমাদের মতে সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুয়া ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে তৈরী করা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের এরূপ ঘটনার সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই বা এ জামাত মারামারি বা বল-প্রয়োগ জাতীয় এরূপ কাজে কখনই ব্যাপৃত হয় না। ১৯১২ সাল থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের (তথাকথিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়) সদস্যগণ বাংলাদেশে বসবাস করছে- কোন সময় অত্যাচারিত বা নিগৃহিত হয়েও এ জামাত বা তরীকার সদস্যগণ কারো সাথে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি।

আমাদের তরীকার লোকদের জড়িয়ে এরূপ সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ সংবাদটি বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ষড়যন্ত্রমূলক, ভূয়া, বিভ্রান্তিকর এবং আন্তর্জাতিক মৌলবাদ চক্রের পরিকল্পিত কার্যক্রমের বহির্প্রকাশ। ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে ভবিষ্যতে এরূপ সংবাদ পরিবেশনে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট দৈনিকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সবিশেষ অনুরোধ করা হলো। কতিপয় মৌলবাদী সন্ত্রাসী এরূপ অমূলক ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ দিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

- এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী উমুরে আমা

# পর্দা প্রগতির দিশারী

(পঞ্চম কিস্তি)

## নারী শিক্ষা ও পর্দা

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে কোন ধর্ম নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে নি। নারীগণের জ্ঞান অর্জনের কথা কখনও কল্পনা করার সৌভাগ্য হয় নি। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান শিক্ষক হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নর-নারী উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক হিসাবে ধর্মীয় বিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেকটি মুসলমান নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানের অন্বেষণ কর"।

মহানবীর (সঃ) উপরোক্ত মহান বাণীগুলো নর-নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে উভয়ের সমান মর্যাদা ও অধিকার বিদ্যমান। আর মেয়েদের মান-সম্ভ্রম ও অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষা গ্রহণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো পর্দার বিধান। কারণ শিক্ষালয়ে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ও বন্ধুত্ব করার সুযোগ থাকলে উভয়ের মনের কামনা-বাসনার আকাঙ্ক্ষার কোমল বৃত্তিগুলোর প্রতিফলনে অনেকের মাঝে অবৈধ প্রেম সৃষ্টি হয়। মেয়েরা চোখ ঝলসানো পোষাক ও অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে নিজের রূপ যৌবন প্রদর্শনে উভয়ের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। কখনও ভাল লাগার সূত্রে ভালবাসার প্রেক্ষিতে যৌনতার সৃষ্টি হয়। অনেকে প্রেম সূত্রের আকর্ষণে অভিভাবকের অবাধ্য ও ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে গাঁট-ছড়া বাঁধে। এমন কি মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভে ব্যর্থ হলে আত্ম হত্যার ঘটনাও ঘটে। আবার কখনও সহপাঠি ছাত্র কর্তৃক ছাত্রী বান্ধবী পাশবিক, দৈহিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়। কখনও বিদ্যাদানকারী শিক্ষক কর্তৃক ধর্ষণের মত বর্বরোচিত কলঙ্কদায়ক ঘটনাও ঘটে। ছাত্র-শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন শিক্ষালয়ে ঘটেছে। এমনকি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব বর্বরোচিত ঘটনা ঘটেছে। আর সারা বিশ্বের এর ভয়াবহ চিত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট খুবই বিভীষিকাময়।

কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য সুশিক্ষিত হওয়া। মানুষের মাঝে সুপ্ত মনুষ্যত্বের গুণাবলীকে বিকশিত করা। উন্নততর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া। দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রগতিশীল মানুষ গড়ে তোলা। তাই ইংরেজীতে বলা হয় Education is the back bone of the Nation অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু মানুষ গড়ার কারখানা শিক্ষালয়ে যেখানে জ্ঞানের আলোর বিস্ফোরণের কথা সেখানে বেপর্দা ও সহশিক্ষার সুযোগে মেয়েরা নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়। শিক্ষার আলোতে আলোকিত হতে এসে কলঙ্কের কালিমায় নিজের মান-সম্ভ্রম হারায়। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ত্রিমুখী নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। ইরেজীতে তাদেরকে বলা হয় Rough Diamond। ফলে শিক্ষালয়ে শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত। তাই ইসলাম সহশিক্ষাকে নিষেধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুশিক্ষিত হওয়া এবং মেয়েদেরকে দুর্জন শিক্ষিত পুরুষের নির্যাতন হতে রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। পক্ষান্তরে মেয়েদেরকে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দার বিধান পালনে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কেননা, মানবজাতির অর্ধাংশ নারী। তাই প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য নারী শিক্ষার বিকল্প নেই। নারীর মেধা বিকাশের লক্ষ্যে তার চিন্তা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রয়োজন। তাদের বুদ্ধিমত্তা, ধ্যান-ধারণা জ্ঞানের উৎকর্ষ চিন্তা ও গবেষণা নতুন নতুন সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি অপরিহার্য। আর তাহলেই সমাজে নারীদের মূল্যায়ন বৃদ্ধি পাবে।

আধুনিক জ্ঞান-তাপসের অনেকে ইসলামের পর্দা প্রথার সমালোচনায় বলেন, ইসলাম পর্দার বিধানের মুসলমান নারী সমাজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ করে রাখছে। কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। পর্দাহীনতা যদি শিক্ষার মাপকাঠি হতো তাহলে পাহাড়ী উপজাতির মেয়েরা, যারা কখনও পর্দা পালন করে না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত, আধুনিক ও প্রগতিশীল হতো। কিন্তু বাস্তবে তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক অনগ্রসর ও নিরক্ষর। সুতরাং পর্দা প্রথা শিক্ষার অন্তরায় নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার নয়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা সুষ্ঠু পরিবেশ ও একনিষ্ঠতা। আর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশে তা অর্জন করা সম্ভব।

তবে আধুনিক জাগতিক বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অপরিহার্য। কারণ ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের সুকোমল বৃত্তিগুলোকে বিকাশের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথকে সুগম করে। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী অকল্যাণকর শিক্ষা হতে বিরত থাকা প্রয়োজন। মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্য কুরআন ও হাদীসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের জ্ঞান অর্জন প্রধান কর্তব্য। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেন, "সে ব্যক্তি বড়ই সৌভাগ্যশালী যে নিজে কুরআন শিখেছে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। জ্ঞান অর্জন কর। কারণ যারা আল্লাহ্‌র নামে জ্ঞান অর্জন করে তারা ধর্মের কাজ করে। যারা জ্ঞানের কথা বলে তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। যারা এর অন্বেষণ করে তারা আল্লাহ্‌র উপাসনা করে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য বাল্য কালই উপযুক্ত ও কার্যকরী। যখন দাড়ী উঠে যায় তখন 'যারাবা' 'ইয়াযরিবু' পড়তে বসালে কী লাভ হবে। শিশুকালে মেধা শক্তি তীব্র হয়। মানুষের বয়সের অন্য কোন অংশে মেধা-শক্তি এত তীব্র হয় না। বাল্যকালের কোন কোন কথা এখনও আমার মনে আছে। কিন্তু পনর বছর আগের অনেক কথাই এখন মনে নেই। এর কারণ এই যে, প্রথম জীবনে জ্ঞানের ছাপ এরূপভাবে নিজস্ব স্থান করে নেয় এবং অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর বিকাশের বয়সে পৌছার কারণে তা চিত্তে এরূপ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তা আর নষ্ট হতে পারে না" (বক্তৃতা ঃ জলসা সালানা, ১৮৯৭)।

কবি ইকবাল বলেন, "ধর্ম ব্যতীত শিক্ষা শয়তানী শিক্ষা"। সুতরাং সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য বাল্যকাল হতে ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য। বিশেষ করে গৃহ নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও সন্তান লালন-পালন তার মুখ্য দায়িত্ব হবার কারণে সন্তানের তা'লীম-তরবিয়তের জন্য মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। সেথা পর্দার বিধান পালনে ধর্মীয় শিক্ষা আধুনিক শিক্ষায় যে মায়ের সন্তানই আদর্শ চরিত্রবান ও নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত উচ্চ শিক্ষিত বলে।

ইসলামের ইতিহাসে আলোকপাত করলে দেখা যায় ইসলামের প্রথম যুগে আরবের মহিলারা পর্দা-প্রথা পালনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনে পন্ডিত ও কবি হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেন। হুযূর (সঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রাঃ) শিক্ষা ও সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হুযূর (সঃ) যে ছয় বা সাত জন সাহাবাকে জ্ঞানের প্রথম শ্রেণীতে গণ্য করতেন তাদের মধ্যে বিবি আয়েশা ছিলেন অন্যতম। আঁ হযরত (সঃ) তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "তোমরা ইসলামের অর্ধেক জ্ঞান বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট শিক্ষা করবে।" আয়েশা (রাঃ)-এর বাগ্মিতা সম্পর্কে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন- "আমি আয়েশার তুলনায় অধিকতর মার্জিত কোন বক্তার বক্তৃতা কখনও শুনি নি।"

আঁ হযরত (সঃ)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) দৌহীত্র -কন্যা সাকিনা খাতুন, আলীর কন্যা যারকা, ইয়াযিদ আনসারীর কন্যা আসমা ও নজদের অধিবাসী খান্‌সাসহ বহু আরব মহিলা কবি, বক্তা পন্ডিত ও জ্ঞানী হিসাবে দেশে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তথাকথিত আরব সংস্কৃতিতে সেই নারী সমাজের অবদান অসাধারণ ছিল। বিশ্ব দরবারে মুসলমান জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে মুসলমান নারী সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। সুতরাং বর্তমান আধুনিক যুগে মেয়েদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্দার বিধান পালনে পুরুষের সমান্তরাল জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ অপরিহার্য। আর তাহলেই জাতি ও দেশ লাভ করবে সুশিক্ষিত সচ্চরিত্রবান সুশীল শিক্ষিত সমাজ। (চলবে)।

- মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ার ৬০তম সালানা জলসা সুসম্পন্ন

স্বততঃ প্রাণের উচ্ছলতা আর আধ্যাত্মিক অনুসর্গে গত ২৩ ও ২৪শে জানুয়ারী রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার ৬০তম সালানা জলসা '০৩। বৈশ্বিক পরিবর্তন আর পারিপার্শ্বিক ভিন্নতার যোজনায় এবারের জলসা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। এ জলসায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বুযূর্গানে দীন ও ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন।

২৩শে জানুয়ারী নামাযে যোহর আসর জমা আদায়ের পর ২.৩০ মিঃ সভার কাজ শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

প্রথমেই পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলভী মাহমুদুল হাসান মিনহাজ, মোয়াল্লেম। এরপরে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পাঠ করেন 'নবীজী (সঃ)-এর শানে' জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। নযম পাঠের পর মোকাররম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতরম আমীর সাহেব জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্য মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা থেকে তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে তৌহীদ, একতা ও ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বক্তৃতার পর 'কবুলিয়তে দোয়া' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ; সদর মুরব্বী, প্রফেসর আবু শাহেদ সাহেব সীরাতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রণীত "হুজুমে মুশকিলাত মে কামিয়াবী হাসিল করণে কি তারিক" শীর্ষক উর্দূ নামটি পাঠ করেন প্রবীণ বুযূর্গ জনাব আবদুল ওয়াহিদ সাহেব। সবশেষে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী "ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

জলসার ২য় দিন ২৪শে জানুয়ারী'০৩ তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াঁজী সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমেই কুরআন মজীদ থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বিনয় আমীন, দেহাতী মোয়াল্লেম। এরপর "মুনাজাত আওর তবলীগে হক"। নযমটি দুররে সামীন থেকে পাঠ করা হয়।

এর পর বক্তব্য রাখেন মৌলভী মজিদুল ইসলাম সাহেব, মোয়াল্লেম "তরবিয়তে আওলাদ" বিষয়ে, হাফেয সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম, "হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন" ও সদর আনসারুল্লাহ্ মোবাশ্বেরুর রহমান সাহেব সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর মোহতরম মাহবুবুর রহমান "একজন আদর্শ খাদেম এর দায়িত্ব ও কর্তব্য" শীর্ষক বক্তব্য রাখেন। অধিবেশনের সর্বশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব এ. কে. রেজাউল করীম, ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা, "মালী কুরবানী ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত" বিষয়ে।

জুমুআর নামাযের পর ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মারুফ আহমদ। দুররে সামীন থেকে "আওলাদ কে হাক্কা মে দোয়া" নযমটি পাঠ করেন জনাব ওয়াকার আহমদ জুয়েল। "খেলাফতের কল্যাণ ও এতায়াতে নেযাম" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ "দায়ী ইলাল্লাহ্ এর কর্মসূচী ও আমাদের করণীয়" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর সমাপনী বক্তব্যে নসীহতমূলক উপদেশ প্রদান করেন। আমাদের জীবনে কুরআনকে বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানিয়ে সবার জন্য দোয়া করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ আধ্যাত্মিক জলসায়, যার ভিত্তি স্বয়ং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রেখেছিলেন, মোট উনত্রিশটি (২৯) জামাত থেকে প্রায় দেড় হাজার মেহমান অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন বাদ মাগরিব তবলীগী অধিবেশন হয়।

- মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব (জয়)

## চট্টগ্রাম বিভাগ-২ অঞ্চলের ওয়াকফে নও শিশু ও পিতা মাতাদের বিভাগীয় পর্যায়ের ২য় তা'লীম তরবিয়তী ক্লাস সম্পন্ন

'গত ১৪/০১/০৩ইং থেকে ১৭/০১/০৩ইং ৪ দিনব্যাপী মসজিদে বাসেত চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম বিভাগ-২ অঞ্চল চট্টগ্রাম, ফাজিলপুর ও নুসরতাবাদ এর ওয়াকফে নও শিশু ও পিতা-মাতাদের বিভাগীয় পর্যায়ে ২য় বিভাগীয় ওয়াককে নও শিশু ও পিতা মাতাদের ক্লাস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্হামদুলিল্লাহ্।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মেহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ও সমাপনী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, চট্টগ্রাম বিভাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহতরম আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম ও মোহতরম ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব, সদর মুরব্বী। অভ্যর্থনা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম মনসুর আহমদ সেক্রেটারী ওয়াকফে নও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম ও ক্লাস পরিচালক। উক্ত ক্লাসে মোট ৩০জন শিশু ও ১৪ জন পিতা ও ১৬ জন মাতা অংশ গ্রহণ করে।

-মোস্তাক আহমদ খন্দকার
বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
চট্টগ্রাম বিভাগ

## শোক সংবাদ

### কুকুয়া সাহেব বাড়ীর ছোট সাহেব আর নেই!

আমরা অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, কুকুয়া সাহেব বাড়ীর ছোট সাহেব আব্দুল বারী তালুকদার গত ২৬শে জানুয়ারী, ২০০৩ দিবাগত রাত প্রায় ৩টার সময় বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন) এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা আর অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, তিনি ৩১ বছর পর পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। কুকুয়া যাওয়ার পথে বরিশালে বোনের বাসায় তিনি অবস্থান করছিলেন। ২৫ তারিখ দিবাগত রাতে তিনি হার্টস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৭ তারিখ রাত প্রায় ৭.৩০ মিঃ সময় মরহুমের মরদেহ ঢাকা দারুত তবলীগে পৌছলে জানাযার নামায আদায় করা হয়। এতে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মরহুমের অনেক অ-আহমদী আত্মীয়রাও ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে আব্দুল খালেক বাঙ্গালী ও কনিষ্ঠ ছেলে আব্দুল হাই তাঁর সাথে ছিলেন। রাবওয়ার পবিত্র ভূমিতে সমাহিত করার জন্যে তাঁর ছেলেরা তাঁর মরদেহকে সেখানে নিয়ে গেছেন। আমরা মরুহুমের মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত এবং তাঁর পরিবারের সকলকে সমবেদনা জানাচ্ছি। মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্যে ও জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর দারাজাতের বুলন্দীর জন্যেও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট আমরা দোয়া করি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পরিবারবর্গকে সাবরে জামীল দান করুন এবং মরহুমের আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখার জন্যে তাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন।

দক্ষিণ বাংলায় আহমদীয়তের ইতিহাসে মরহুম আব্দুল বারী তালুকদারের নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় পড়াশুনা করার সময় তিনি আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের খবর পান। তিনি ১৯৪৬ সনে ঢাকা তারুত তবলীগে বয়াত করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান স্বল্পভাষী এবং সহজ সরল কথার আহমদী ছিলেন। একজন সৎ মানুষ হিসেবে তাঁর এলাকায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। সত্তর-এর দশকে তিনি কুকুয়া এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি চুনাখালী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। কুকুয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্টও ছিলেন তিনি।

১৯৫৯ সনে যখন আহমদীয়তের সংবাদ পাই এর পর থেকেই তাঁর সাথে যোগাযোগ। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে থেকে আহমদীয়ত সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছি। নামাযে চোখ দিয়ে পানি পড়তে যাঁদেরকে দেখছি তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৯৭১ সনে তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম পাকিস্তানে তাঁকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। চিনির কলে চাকুরী করেছেন তিনি। হুযূর (আইঃ) যখন খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন ওয়াকফে জাদীদে হুযূর (আইঃ)-এর অধীন নিজ স্থলে ফজলে ওমর হোমিও চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত করেন। তিনি একজন ভাল হোমিও চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁর ছেলে-মেয়েদের সকলেরই বিয়ে -শাদী হয়ে গেছে। সবাই আল্লাহ্‌র ফযলে ভাল আহমদী। দেশে আসার আগে তিনি লাহোরে ছেলেদের কাছে থাকতেন। নিয়তির বিধানে দেশে এসে তাঁর মৃত্যু ছিলো তাই তিনি হাসি মুখে সবাকে কাঁদিয়ে আসল গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন। দেশে প্রচুর জায়গা জমি বা মায়ের একমাত্র পুত্র হওয়া সত্ত্বেও মায়ের মৃত্যুও তাঁকে দেশে আনতে পারে নি। মোটকথা তিনি ছিলেন একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ।

**- নির্বাহী সম্পাদক**

আমার আব্বা গাজীপুর জামাতের বিশিষ্ট সদস্য জনাব জহুর আহমদ সাহেব গত ২০শে ডিসেম্বর, ২০০২ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি একজন মিষ্টভাষী ও জামাতের নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর খেদমতে বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

**- কবীর আহমদ, গাজীপুর জামাত**

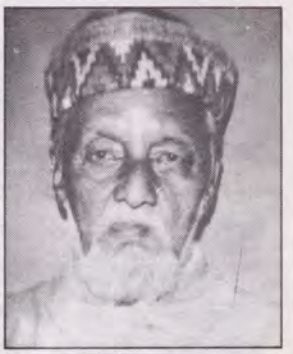

□ আমার পিতা আলহাজ্জ চৌধুরী আব্দুল মতিন গত ২২শে জানুয়ারী, ২০০৩, বাংলাদেশ সময় সকাল ৫.৩০ মিঃ কানাডার টরোন্টো (Toranto)-তে তাঁর কন্যা ডঃ লায়লা আরজুমানের বাসায় ইন্তেকাল করেন, (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় একশ' বছর।

টরেন্টোর (Toranto) আঞ্জুমান সংলগ্ন কবরস্থানে মরহুমের দাফন কাজ সম্পন্ন হয়।

জামাতের সকল বন্ধুর কাছে তাঁর আত্মার মাগফেরাত ও তাঁর দারাজাতের বুলন্দীর জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি।

**- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আহমেদ নাসের চৌধুরী**
মিরপুর, ঢাকা

□ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের মরহুম ফজলুর রহমান সাহেবের স্ত্রী জনাবা নাসিমা আক্তার সাহেবা গত ২২/১/২০০৩ সোমবার বিকেল ৪ টায় রাজশাহীতে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের বাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্যে ও সন্তান-সন্ততির সাবরে জামীলের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**- নাসের আহমদ, এমটিএ**

□ আমার শ্রদ্ধেয় নানা জনাব আব্দুল গফুর চৌধুরী গত ০৬/০১/০৩ইং তারিখ রোজ সোমবার রাত ১০টায় ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। তিনি একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও পুত্র বধুদ্বয় সহ অসংখ্য গ্রণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে করুণাময় আল্লাহ্ যেন ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাতসহ তাঁকে বিধাতা যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন, তজ্জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট খাসভাবে দোয়াপ্রার্থী।

**- মাহমুদ আহমদ সুমন**
মোয়াল্লেম

**TRUST THE LOGO**

**CALL CONCORD**

## CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

CONCORD

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

## Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

**Business Solution :**

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

**Address :**

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

## ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

## সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

## সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

**PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.**

**AIR-RAFI & CO.**
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆14th & 15th Issue January 31, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

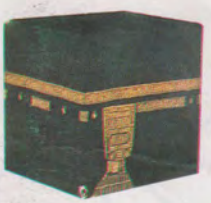

# Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

**ASIASAT 2**

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

**DISH POSITION 100.5° EAST**

| | | |
|---|---|---|
| FREQ. | - | 3660 |
| S.R | - | 27500 |
| POL | - | VERTICAL |

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com